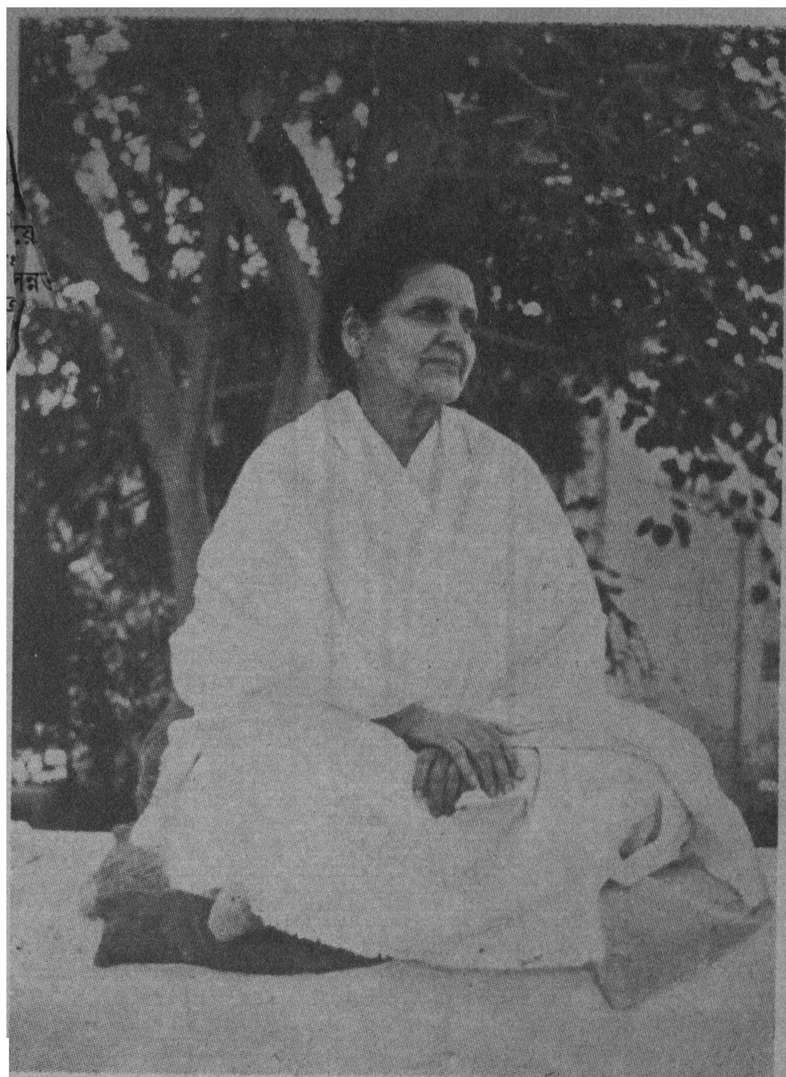


পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী



মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীনিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

মুদ্রাকর
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা ১৪

যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো,
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥

অন্য দেবতার উপাসনায় যদি ভোগলাভ হয়, তাহলে মোক্ষলাভ হয় না, যদি মোক্ষলাভ হয়, ভোগলাভ হয় না। কিন্তু মা'র চরণপদ্ম অর্চকদের ভোগ মোক্ষ দুই করতলগত হয়।

* *

*

হে পথিক বন্ধু মোর! যে কেহ হও না তুমি,
এস আজি, চল মোর সাথে,
মিলে আমার সাথে, পাইবে খুঁজিয়া যাতে
শ্রান্তি কভু স্পর্শে না তোমাতে।

* * *

হতাশ হয়ো না কভু, অগ্রসর হয়ে চল
এস তুমি মোর পাশে আজ,
দুয়ারে রয়েছে জেনো দৈবীসম্পদুভার
চলিবার এ পথেরি মাঝ।

। ওয়াল্ট হুইটম্যান

উৎসর্গ

আনন্দময়ী মা'র জননী ভক্তদের দিদিমা, চির-সন্ন্যাসিনী মুক্তানন্দ গিরির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত হল।

গ্রন্থকার



পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

এক

মা আবার ফিরে এলেন। ভক্ত হৃদয়ের আহ্বানে। এই সংসারের নিকেতনে। একটি শান্ত শুভ্র মঙ্গল-রশ্মির মত। প্রাণঢালা প্রেমঢালা সরলতার মত। অমোঘ সন্তোষ নিয়ে। একটি প্রেমার্দ্র দৃষ্টি নিয়ে, যাতে এই ঘোর দুর্দিনেও ভক্তরা দেখতে পায় তাঁর প্রেমমুখের প্রসন্নতা। প্রেমমন্ত্রই যে মায়ের মন্ত্র। আর এই প্রেমই মায়ের শাশ্বত বাণী। মনের মাধুর্য। আত্মার প্রশান্তি। মা বলেন, 'হরিকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।' 'গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল নন্দদুলাল প্রেমগোপাল।' কিন্তু সেই প্রেমসাধনার রাজ্য, সেই প্রেমগোপালের লীলাস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনও যে আজ শুষ্কপ্রায়। প্রাণহীন। কৃষ্ণের সেই সুমধুর বাঁশরীর সুরধ্বনি আর শোনা যায় না। লীলাভঙ্গে চঞ্চলিত শ্রীরাধারাণীর দেহচ্ছায়াও আজ আর দেখা যায় না। নৃত্যচঞ্চল ধ্বনি গভীর রাতের স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে ঘুরে বেড়ায় না নিধুবনে। যমুনার তীরে তীরে। একদিন যে শুভক্ষণে শ্রীরাধারাণী মাল্যদান করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে, যমুনার কলস্বরে অভিনন্দিত হয়েছিল যে মিলন, সেই যুগলমিলন রাসলীলার সাক্ষী ছিল শ্রীযমুনা। সেই স্মৃতিচারণ করে আজও তাই যমুনা ডাকে। ডাকছে যমুনা তার পুরাতন বৃন্দাবনকে। গভীর রাতের স্তব্ধতায় নির্জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শোনা যায় যমুনার কলধ্বনি। কিন্তু যমুনার সে কলস্বর শুনতে কলক্রন্দনের মতই যেন মনে হয়। সে ডাকে কাঁপন লাগে কালিন্দী নদীর বিষণ্ণ জলে। আনন্দময়ী মার হৃদয়ে। আনন্দময়ী মা শুনতে পেলেন যমুনার সেই কলধ্বনি। কলধ্বনি নয়, কলক্রন্দন। ক্রন্দন-ধ্বনি নয়, যমুনার করুণ মর্মস্পর্শী হাহাকার। বেদনার্ত হয়ে ওঠে

আনন্দময়ী মার দুই চক্ষু। যমুনার আহ্বানকে পিছনে ফেলে রেখে জ্ঞানাকাশে লীন হতে পারলেন না। জীবদেহ ধারণ করে জীবের সুখ দুঃখকে ভুলে হিমালয়ের নির্জনতায় চিরবিশ্রাম নেওয়া আর হলো না। প্রেমঘন মূর্তি নিয়ে আবার ফিরে এলেন হিমালয় থেকে শ্রীবৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে। সৃষ্টি করলেন নব-বৃন্দাবনের। আনন্দময়ী বৃন্দাবন। আর সেই নব-বৃন্দাবনের নায়িকা হলেন আনন্দবিলাসিনী শ্রীরাধারাণী নয়। শ্রীআনন্দময়ী। আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্তির মূর্তপ্রকাশ আনন্দময়ী মা।

অতন্দ্র লীলাবিলাস চলতে লাগলো বৃন্দাবন ধামে। দোল পূর্ণিমার উৎসব। হোলি উপলক্ষে নানা জায়গা থেকে ভক্তরা এসেছে। আনন্দময়ী আশ্রম আনন্দে মেতে উঠেছে। মা নিজেই নিজের মাথায় গায়ে রং ও আবির দিতে লাগলেন। এ দেখে ভক্তরা মহাউৎসাহে মাকে রং দিতে লাগলো। আবির খেলা সুরু হয়ে গেল। এবারে মা রং দিলেন পণ্ডিত সুন্দরলালজীকে। পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন, হরিবাবাকে রং দিতে পারলে তো বুঝবো!

মা হরিবাবার আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। হরিবাবা দোতলায় দরজা বন্ধ করে রেখেছেন, যাতে কেউ রং দিতে না পারে। মা এসেছেন শুনে ছাতের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীমা পিচকারী দিয়ে রং দিলেন শ্রীশ্রীহরিবাবাকে। হরিবাবার আশ্রম থেকে মা এলেন অখণ্ডানন্দজীর আশ্রমে। অখণ্ডানন্দজী মাকে দেখে বের হয়ে এলেন, মা তাঁকেও রং দিলেন। তারপর হেসে হেসে বললেন, —'পিতাজীরা সন্ন্যাসী ঠিকই। কিন্তু যদি পাহাড় পর্বতে চলে যেতেন তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। বৃন্দাবনে যখন থাকা হইতেছে, তখন রং লাগিবেই।' ভক্তবৃন্দ সকলেই হেসে উঠলো। মা আবার অখণ্ডানন্দজীর নিকট হাত জোড় করে বললেন, 'পিতাজী, বাচ্চির অপরাধ নিও না।' তারপর হাসতে হাসতে মা ভক্তবৃন্দসহ চলে এলেন কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে। মা আজ কাউকেই ছাড়ছেন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মেতে উঠেছেন। সঙ্গে রাজা মহারাজা রাণী মহারাণী ও অন্যান্য ভক্তরাও খালি পায়ে চলেছেন মায়ের পিছু পিছু পথে পথে আশ্রমে আশ্রমে। কীর্তন করতে করতে।

> 'মধুর এই হরে কৃষ্ণ নাম আবার বল। আবার বল হরিনাম, আবার বল। গৌর হরি বোল, প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরিবোল ॥'

মৃদঙ্গ খোল করতালের ধ্বনিতে ভক্তবৃন্দের মনে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হলো।

মা এবারে কাঠিয়াবাবার আশ্রমে গিয়ে মোহন্ত ধনঞ্জয়দাসজী ও অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীদের গায়ে রং দিলেন। এমন কি গরু তুলসী গাছ কিছুই বাদ দিলেন না। দোল উৎসবে মা নিজেও মাতলেন, ভক্তবৃন্দ সাধু সন্ন্যাসীদেরও মাতালেন। আজই আবার আনন্দময়ী আশ্রমে দুইটি শিব প্রতিষ্ঠা হলো। শিবরাত্রির দিনে একটি শিব স্থাপনা করা হয়েছিল, তার নাম 'গোপেশ্বর'। আজ যে দুইটি স্থাপনা করা হলো তাঁদের নাম রাখা হলো সিদ্ধেশ্বর ও বাণেশ্বর। ব্রহ্মচারী হিরুর উপর পূজার ভার দেওয়া হলো।

মা বৃন্দাবনেই রয়েছেন। এক আশ্চর্যজনক ঘটনা, হঠাৎ মা বায়ুমণ্ডলে ও নিজের শরীরে কেবলই পোড়া গন্ধ অনুভব করতে লাগলেন। মা বললেন, শরীরের ভিতর হইতেই এ গন্ধ। অবশেষে জানা গেল নিম্বার্ক আশ্রমের বিগ্রহ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার দলাদলি গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। মাকেই আবার তার বিচার করতে হবে। মায়ের উপর যে দুই দলেরই শ্রদ্ধা আছে। মা বললেন,

> দেখ, ঠাকুর এইভাবে অগ্নিদগ্ধ হলো। এখনও কি বিরোধ করবার সময় আছে ? তোমরা সকলে গুরুভাই। উভয় পক্ষই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে মিলে যাও।

কিন্তু বিরোধ অত সহজে মিটলো না। শেষে কোর্ট কাছারী পর্যন্ত উপস্থিত হলো। মোহন্তজী নিজেই বিগ্রহের পুনঃস্থাপনা বিষয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করলেন। মা বললেন,—

> পুনরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তুমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য অপরপক্ষের হাতে সব ভার দিয়ে অন্যত্র গিয়ে সাধন ভজন কর। তাহলে ফল ভাল হয় নাকি বাবা? পরে যদি তোমার এই আশ্রমে আসতে অসুবিধা হয় তবে না হয় নূতন আশ্রম করে বৃন্দাবনেই বাস করো। এইসব মামলা মকদ্দমাব ভিতর না গিয়ে নিজের আদর্শে অটুট থাকা ঠিক নয় কি?

মা আবার বললেন মোহন্তজীকে, শুনেছি কাঠিয়াবাবার সময়ের এই মূর্তি সন্তদাস বাবাজী নূতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। এই মূর্তির স্থান খালি রাখতে নেই। শীঘ্রই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা দরকার।

বিগ্রহাদির ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত লোকের অভাবের কথা জানালেন মোহন্তজী। মা ভক্ত এনজিনিয়ার শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্তীর উপর জয়পুর থেকে বিগ্রহ আনবার দায়িত্ব দিলেন। মোহন্তজীও মাকে অনুরোধ করলেন মা যেন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বৃন্দাবন ধামেই থাকেন।

অবশেষে বিগ্রহও আনা হলো। মোহন্তজী সংকল্প করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু করে দিলেন। আশ্রমে শ্রীশ্রীমাকে আগ্রহ সহকারে নিয়ে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল অপর পক্ষীয় দল নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে বাধা প্রদান করবে। কোর্টে দরখাস্ত করেছে তারা।

মা বললেন, 'যা হয়ে যায়। অধিবাস সংকল্প করে প্রতিষ্ঠায় বাধা হচ্ছে। ভয়ানক কথা।'

ধীরে ধীরে নিম্বার্ক আশ্রমের গণ্ডগোল মেটাবার সমস্ত দায়িত্বই

[illegible] আর সমস্ত দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন। মোহন্তজীর বিরোধী পক্ষের কাছে মা পাঠালেন গুরুপ্রিয়াদেবীকে নির্দেশ দিয়ে। গুরুপ্রিয়াদেবী তাঁদের বললেন, 'সংকল্প যখন হইয়া গিয়াছে তখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া কি সঙ্গত? আমরা ত মায়ের নিকট শিক্ষা পাইয়াছি সব আশ্রমই এক। ভিন্ন ভাব রাখা ঠিক না।' নিম্বার্ক আশ্রমের একজন এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন, মায়ের পক্ষ থেকে গুরুপ্রিয়াদেবী যেন কোর্টে যান, তাহলেই মামলার একটা সুরাহা হবে।

প্রত্যুত্তরে মা বললেন, বেশ, তোমরা নিতে চাও নিয়া যাও। গুরুপ্রিয়াদেবী নারায়ণ স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে মথুরা কাছারী গেলেন। মায়েব নির্দেশ ও আদেশ পালন করতে। - মা বললেন গুরুপ্রিয়াদেবীকে, মোহন্তজীকে বলবি যে এই শরীরের কথা যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য সব ত্যাগ করা—প্রস্তুত থাকা শ্রেয়।

গুরুপ্রিয়া দেবীও কাছারীতে গিয়ে বললেন মোহন্তজীকে, আপনাকে গুরু মহারাজ সর্বপ্রধান করে গেছেন। আপনাকে পদের মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে। আপনি দয়া করে লিখে দিন ঠাকুরজীর প্রতিষ্ঠার বাধা দূর করবার জন্য আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। মারও এই মত। এতে আপনার মর্যাদা বাড়বে বই কমবে না। যে পদমর্যাদা আপনাকে গুরু মহারাজ দিয়ে গিয়েছিলেন তার সম্মান রক্ষা হবে। আমরা কিছুতেই আপনাকে মামলা মকদ্দমার মধ্যে যেতে দেবো না।

মোহন্তজী মৌন ছিলেন, স্লেটে লিখে জানালেন, —'মা যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।'

অবশেষে সেই মতই ব্যবস্থা করা হলো। সব ঠিকমত লেখাপড়া হয়ে গেল। উভয় পক্ষের বিরোধ মিটে গেল। উভয় পক্ষই খুশী মনে কাছারী থেকে ফিরে এলেন।

বললেন,—'গুরুদেবই আজ মাতৃরূপে এসে [illegible]'

মাও আনন্দের সঙ্গে বললেন, 'বেশ হয়েছে। এখন সকলে মিলে মিশে আনন্দের সঙ্গে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে যাও।'

৫ই মার্চ ১৯৫৩ নিম্বার্ক আশ্রমে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো। মহা মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো আশ্রম মন্দির সব কিছু। পরবর্তীকালে নিম্বার্ক আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠলে ভক্তপ্রবর ডাঃ পান্নালালজী বলেছিলেন মাকে এই রকম আর কোথাও পাওয়া যায় না, যে দুই দলই খুশী।

মা হেসে হেসে বলেছিলেন, আসল হাইকোর্টের রায় কিনা! ভগবানের রায়। স্বয়ংই প্রতিষ্ঠিত হইলেন যে। কেহ কেহ হয়তো মনে করিয়াছিল যে মা এক পার্টির পক্ষ নিবেন। উহারা ত জানে না পিতাজী যে এই শরীরটা কোনও পক্ষ অপক্ষের মধ্যেই নাই। এই শরীরটার কাছে সব সমান। এক চুলও এদিক ওদিক হয় না। যে যা ভাবুক না কেন?

এই প্রসঙ্গে মা আবার বলছেন, 'গতবার যখন বৃন্দাবনে যাওয়া হইয়াছিল মোহন্ত বাবাজী এই শরীরটাকে নিজেদের আশ্রমে নিয়া গিয়াছিল। কীর্তন ইত্যাদি হইল। তাহার পর ফল ইত্যাদি নিয়া নিজের হাতে বসিয়া বসিয়া এই শরীরটাকে খাওয়াইয়া দিল। এতটা আর অন্য কোনও সময় হয় নাই। তখনই এই শরীরটা ছোট বেলার একটি গল্প তাহার কাছে বলিয়া ছিল। নিম্বার্ক আশ্রমেব যে মূর্তি এখন বদলান হইল সেই মূর্তি যখন সন্তদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন এই শরীরটা বিদ্যাকূটে ছিল। শরীরের জেঠিমা ছিলেন সন্তদাস বাবাজীর ভগ্নী। তাঁহার নিজের ছেলেমেয়েরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠার উৎসবে বৃন্দাবনে গেল। সন্তদাস বাবাজী এই শরীরের পিতাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি নাকি এই শরীরের পিতা-মাতা সকলকেই প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু একথা

[illegible] এই শরীরের জেঠিমা এই শরীরটাকে এত ভালবাসিত যে নিজের বউ মেয়ের কাছেও এত মন খুলিয়া কথা বলিত না। আর কি বলিত জান যে 'এর কাছে কথা বলা ত কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া রাখা।' কিন্তু আশ্চর্য এই শরীরকে জেঠিমা এত আদর স্নেহ করা সত্ত্বেও একবারও যাইতে বলিলেন না। তখনই এই শরীরের একটু হাসি আসিল,—'এই ত জীব স্বভাব।'

একটু থেমে মা আবার বলছেন, এবার যখন ঠাকুরের দগ্ধ মূর্তি দেখা গেল তখন ঠাকুরের সারা অঙ্গে হাত বুলাইয়া দিয়া বলা হইল, 'ঠাকুর, তুমি এই মূর্তিতে দেখা দিলে?' আবার যখন সেদিন নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল তখনও আবার বিগ্রহের সারা শরীরে হাত বুলাইয়া গায়ে মাথাটি ছোঁয়াইয়া এই খেয়ালটি, পিতাজী, কেমন এক ভাবে আসিল যে, ঠাকুর সেবার প্রতিষ্ঠায় আনলে না। এবারের প্রতিষ্ঠায় শরীরটাকে তোমার কাছে রাখবে বলেই কি তোমার এই দগ্ধ মূর্তিতে প্রকাশিত হতে হল?'

ধীর গম্ভীর নিগূঢ় অর্থপূর্ণ করুণামাখা মায়ের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি শুনতে শুনতে ভক্তবৃন্দও চিন্তান্বিত হলেন। করুণায় ভরে উঠলো তাঁদের মন।

শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি সব দিকেই আছে। সন্তদাস বাবাজীর আশ্রমের মোহন্ত ধনঞ্জয়দাস বাবাজীর যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেইজন্য স্বামী পরমানন্দজীকে রায়পুর আশ্রমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। রায়পুর আনন্দময়ী আশ্রমে মোহন্ত বাবাজী কিছুদিন একান্তে বাস করবেন।

শ্রীশ্রীমা এখন কাশীতে। আশ্রমে গীতা জয়ন্তী সুরু হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় এসেছেন। দেবী ভাগবৎ সপ্তাহ, বাসন্তী পূজা ও গীতা জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কাশীর আশ্রমে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। সোলনের রাজা সাহেব,

টিহরীর মহারাজা মহারাণী, আম্বের রাজা-রাণী ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাধারণ অসাধারণ বহু ভক্ত এসেছেন। আনন্দ উৎসবে, মহা-মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম। এই আনন্দ উৎসবেও আম্বের রাজা-রাণীর মনে শান্তি নেই। তাঁদের একমাত্র পুত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আশংকাজনক অবস্থা।

আনন্দময়ী মাও গুরুপ্রিয়াদেবীকে রাত্রে হঠাৎ ডেকে বললেন, —ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি দেখছি।

আবার একদিন মা বললেন, হঠাৎ একটা কথা শুনলাম 'কাল চলে যাবে।' কথাগুলির লক্ষ্য যেন ছেলেটি।

মা এবারে ব্রহ্মচারী কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে যে ঘরে ছেলেটি শুয়ে ছিল সেখানে গেলেন এবং ইসারায় ব্রহ্মচারীকে নাম জপ করতে বললেন মৌন হয়ে। কেউই কিছু বুঝতে পারলো না। মা নীরবে সবকিছু করতে লাগলেন ছেলেটির মঙ্গলের জন্য।

ইতিমধ্যে আরও একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি মা দেখলেন,—

> —লাল রং, জিহ্বা লক্ লক্ করছে। মা তাকে বার বার আদেশ করলেন অন্যদিকে চলে যাওয়ার জন্য। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে অন্তর্হিত হলো।

আশ্চর্য ব্যাপার, এর পর থেকেই ছেলেটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। মা'র কৃপা কখন কিভাবে যে কার উপর বর্ষিত হয় কেউ বলতে পারে না।

মা বললেন, 'খেয়াল হলে এই রকম হয়। আবার খেয়াল না হলে কিছুই হয় না। হয়ত বসে বসে তামাসা দেখার মত দেখছে। যা হয়ে যায়।'

এইভাবে মা কাশীর লীলা সাঙ্গ করে রওনা হলেন কলকাতার পথে। কলকাতায় এসে উঠলেন একডালিয়া রোডের আশ্রমে। অগণিত ভক্ত সমাগম হলো। এত ভিড় যে মানুষ চাপা পড়ার অবস্থা। মা বেশী সময় থাকতে পারলেন না। বের হয়ে পড়লেন।

ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্তের বাড়ি। তিনি ছিলেন মহীশূর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। শ্রীশ্রীমায়ের পরমভক্ত। সেখান থেকে আরও কয়েকজন ভক্তের বাড়ি পদধূলি দিয়ে সোজা এসে উপস্থিত হলেন হাওড়া স্টেশনে। যাত্রা করলেন শ্রীক্ষেত্রের পথে। পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে। সঙ্গে চললেন ভক্তপ্রবর শ্রীশশধর ভট্টাচার্য, শ্রীনির্মল চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপকুমার দত্ত, শ্রীমান সুবিমল, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীমতী রেখা ও ব্যাঙ্গালোরের অরবিন্দ বসু। ১৯৫৩ সনের ২০শে এপ্রিল মা ভক্তবৃন্দসহ এসে পৌঁছালেন পুরীধামে।

পুরীতে আবার মার সূক্ষ্ম দর্শন হলো। মা দেখলেন অতি সুন্দব সুন্দর চিহ্নযুক্ত ১০০৮টি নারায়ণ শিলা।

নিকটে আরও কেউ ছিল। সে যেন বলছে, (শ্রীশ্রীমাকেই দেখিয়ে) 'ঐ মূর্তিটি নারায়ণ শিলা দিয়ে করতে বল না।' আর ঐসব নারায়ণ শিলা দর্শন করেই বোধ হয় মা ফিরবার পথে জগন্নাথ মন্দির হয়ে স্টেশনে এসেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, জগন্নাথ দেবের বেদীর নিচে অনেক অমূল্য নারায়ণ শিলা রাখা আছে।

এই সেই শ্রীক্ষেত্র! পুরীধাম! গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহান তীর্থক্ষেত্র। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র। একদিন এখানকার মাটি আর বাতাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম কীর্তনের সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে থাকতো। ভক্তকণ্ঠের হরিনাম গানে আর সুধাস্রাবিত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রেমজলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, ডুবিয়ে দিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রের স্থাবর-জঙ্গম গুল্মলতা। আজও তাই মনে হয় শ্রীক্ষেত্রের পথে পথে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী, সঙ্গে নিতাই আনন্দমুঞ্জরী। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা ভাবতে ভাবতে শ্রীশ্রীমাও যেন আজ নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কেন জানি উদাস হয়ে যায় মায়ের মন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায়

ছাওয়া যে শ্রীক্ষেত্রের মাটি আর আকাশ বাতাস। [illegible] শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি। শ্রীমহাপ্রভু নিজ হাতে দিয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের মত ভক্ত আর হয় না। কি দৈন্য তার। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতে পর্যন্ত যেতেন না। মন্দিরের কাছেও তিনি যেতেন না, পাছে জগন্নাথের সেবক তাঁকে ছুঁয়ে ফেলে। দূর থেকে তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করতেন, আর অমনি মহাপ্রভুও বুকে জড়িয়ে ধরতেন ভক্তপ্রাণ হরিদাস ঠাকুরকে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলতেন, প্রভু! আমায় ছোঁবেন না, আমি অস্পৃশ্য যবন। এত করুণা কেন প্রভু! শ্রীমহাপ্রভু দৈন্য করে বলতেন, 'আমি তোমায় আলিঙ্গন করে নিজে ধন্য হই, তুমি দৈন্য ছাড়।'

হরিদাস ঠাকুর থাকতেন মন্দির থেকে অনেক দূরে। নির্জন বাগানে। সেখানে রোজ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করতেন। মহামন্ত্র জপ।

ভক্তকে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর রোজ এসে দর্শন দিতেন। ভোরে সর্বপ্রথম জগন্নাথদেবকে দর্শন করেই দর্শন দিতেন হরিদাস ঠাকুরকে। হরিদাস ঠাকুরের গায়ে রোদ লাগত তাই শ্রীমহাপ্রভু বকুলের ডাল দাঁতন করতে করতে সেখানে পুঁতে দিলেন। অতি দ্রুত গাছ বড় হলো। ছায়াও হলো। আর তার তলায় বসে মহানন্দে নাম করতে লাগলেন হরিদাস ঠাকুর। এমনই হলো ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য লীলা! বৃক্ষের ভিতর শাঁস হলো না। শুধু বল্কলের উপরই বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে রইলো। এরও একটা কারণ আছে। পরবর্তীকালে শ্রীজগন্নাথের রথ তৈরী করবার জন্য ঐ গাছ কাটবার কথা হয়েছিল। মিস্ত্রীও এলো গাছ কাটতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! গাছ কেটে কি হবে! গাছের যে শাঁসই নেই। সকলে বুঝলো বৃক্ষটি মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গী যে! তাকে কেটে ফেলা, মুছে ফেলা কি এতই সহজ!

একদিন হরিদাস ঠাকুর অসুস্থ হয়েছেন। মহাপ্রভু এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

প্রত্যুত্তরে হরিদাস ঠাকুর বললেন,—আমার অসুস্থ বুদ্ধি আর মন। নাম সংখ্যা ঠিকমত করতে পাচ্ছি না।

মহাপ্রভু বললেন,—তোমার তো সিদ্ধ দেহ তবে এত সাধন কেন?

—তোমার জন্যই ত আমার এ সাধনা। প্রভু! আমার একটা প্রার্থনা তোমায় পূরণ করতে হবে। তোমার অপ্রকট লীলা আমি দেখতে পারবো না। আমার শেষ সময় তুমি এসে তোমার শ্রীচরণ আমার মস্তকে দেবে এবং আমার নয়নভৃঙ্গ তোমার মুখকমল মধু পান করতে করতে আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতেই যেন দেহলীলা সম্বরণ হয়।

শ্রীল মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের এ প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। ভক্ত যাই বাঞ্ছা করবেন তাই তিনি দিতে যে বাধ্য! নইলে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু এ নাম যে থাকে না। তারপর হরিদাস ঠাকুর একদিন সত্যসত্যই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীমহাপ্রভু কাছে এলেন। শ্রীচরণ মস্তকে দিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নয়নভৃঙ্গ শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্মে ডুবে গেল। আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলতে প্রাণ কৈল উৎক্রমণ। এবারে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উঠিয়ে, তিনি বক্ষে তুলে নিলেন। তারপর স্কন্ধে রেখে নৃত্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভু তাঁকে সমুদ্রে নিয়ে স্নান করিয়ে বললেন, 'আজ শ্রীহরিদাসের পাদপদ্ম স্পর্শে সমুদ্র মহাতীর্থ হলো।' পুরীর সমুদ্র বৈষ্ণবদের মহাতীর্থই বটে!

শ্রীক্ষেত্রের এই মহাতীর্থে এসে সমুদ্র দর্শন করে মায়েরও ভাব হলো। হরিদাস ঠাকুরের ভাব। শ্রীগৌরসুন্দরের ভাব। মা যেন গৌরসুন্দরের শ্রীক্ষেত্রের লীলা প্রত্যক্ষ করছেন আর অভিভূত হয়ে পড়ছেন। সেই শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নিতাইচাঁদ সকলকেই প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁদের কণ্ঠনিঃসৃত নামগানও যেন শুনতে পাচ্ছেন। সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ

হরে হরে নাম। কেহ কৃষ্ণনাম করছে, কেহ শ্যামসুন্দর বলছে, কেহ রাধারমণ বলছে, কেহ বৃন্দাবনবিহারী বলছে। সব নামই সেই কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে। গৌরসুন্দর রাধাভাবে কৃষ্ণকে ডাকছেন। আকুল কণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে বলছেন, কোথা কৃষ্ণ! দেখা দাও! দেখা দাও! আর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছে। শ্রীশ্রীমায়েরও তখন অপূর্ব মুখশ্রী, মধুর চাহনি আর গদ গদ ভাব দেখে ভক্তরা বলছেন,—'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার ভাবাবেশের কথা বইতে পড়েছি তাই আজ মায়ের অঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি।' সে সময় মায়ের আধ আধ জড়ানো কথা সমবেত ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ করে তুললো। মাও ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, নাম কর। নাম কর। নামেই সব হবে। নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা হতেই ফুটে ওঠে।

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!
গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল, নন্দদুলাল প্রেমগোপাল!

দুই

'সাধন মানে নিজেকে নিবার জন্য তাঁকে সাধা। অর্থাৎ আমায় নেও নেও বলিয়া সাধা।' মা বলছেন ভক্তদের। কলকাতায়। মা পুরীধাম থেকে আবার ফিরে এসেছেন কলকাতায়। স্টেশন থেকে সোজা চলে গেছেন আন্দুলে শ্রীনীরদ তালুকদারের বাড়িতে। নীরদবাবু অনেকদিন ধরে মায়ের পদধূলি পাবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। ভক্তের সে আশা-প্রার্থনা এবারে পূর্ণ করলেন। সেখান থেকে প্রভাদেবীর আহ্বানে গেলেন উত্তরপাড়ায় স্যার সত্যচরণ মুখার্জীর বাড়ি। উত্তরপাড়া থেকে এলেন বরানগরে শ্রীযুত প্রফুল্ল ঠাকুরের বাড়ি। এইভাবে কয়েকজন ভক্তের বাড়ি পদধূলি দিয়ে উঠলেন এসে একডালিয়া রোডের আশ্রমে। আশ্রম বাড়ি তখন লোকে লোকারণ্য। অগণিত ভক্ত সমাগম হয়েছে। কিছুক্ষণ নীচে হলঘরে ভক্তদের দর্শন দিয়ে উপরে চলে গেলেন বিশ্রাম করতে। এইভাবেই সকাল গেল দুপুর গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। এদিকে ডাঃ অনিল মৈত্রের বৃদ্ধা মা কিছু খাবার বানিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন ব্যারিস্টার অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ পিতা। মায়ের পুরাতন ভক্ত বৃদ্ধ শ্রীযুত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত। শ্রীযুত বিনয় সেন। মা সকলেরই ইচ্ছা আশা প্রার্থনা পূরণ করলেন। সকলের গৃহেই উপস্থিত হয়ে আনন্দদান করতে লাগলেন। আনন্দের আধার শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা। মা হেসে হেসে বলছেন, 'দেখ সকলেই ভাবিতেছে যে এ শরীরটা তাদের বাড়ি যাইতেছে। তাই তাদের এত আনন্দ। এ শরীরটা মোটেই কারো বাড়ি যায় না। এ শরীরটার কাছে ত সব স্থানই সমান। এ শরীরটার ত এক কথা—

কাহারো সঙ্গে কথা বলি না, কাহারো কাছে যাই না, কাহারো খাই না।' মা আবার ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন, ভগবানের নাম করিও। যতটা পার তাঁকে ডাকিও। আমি ত আবোল তাবোল কত কি বলি। সব সময়ই বদলাচ্ছে। একটা পাকা চুলও ত দেখ নাই। এখন কত পাকা চুল। আবার বলছেন, এই শরীরটার কথা বলিয়াছি মনে করিও না। এক তিনিই ত সব।

মা আবার আপন মনে হাসি হাসি মুখে বলছেন, ভাবটা স্বাভাবিক নয়,—বিবাদ বন্ধ কর। বিবাদ মানে যে বাদে তাঁকে পাওয়া যায় না। সাত্বিক ভাব জাগ্রত কর। ভগবান সাক্ষাৎ, সত্যই সাক্ষাৎ। আপনাকেই ত পাওয়া। আপনা বল আত্মা বল। কেবল গণ্ডিবদ্ধ, দিকনিবদ্ধ ভাব হইতে ছুটি পাওয়া। তোমরা যখন যেখানেই যেভাবে থাক, শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ। কেবল নির্ভর। গুরুদত্ত উপদেশ এক লক্ষ্যে অখণ্ডভাবে পালনের চেষ্টা করা। একমাত্র তাঁরই প্রকাশ, সেই জ্ঞানটা অখণ্ডভাবে বজায় রাখবার জন্য মহাশক্তি মায়ের আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা। সর্বরূপী যে মা তা জান না ? যা কিছু তাঁহারই রূপ।

আবার মা গুণ গুণ করে গাইছেন,

'যাবে কোথা আর
সবই যে এক তাঁর।
ঐ যে সারাৎসার
তিনিই করেন পার।'

এইভাবে কলকাতার লীলা সাঙ্গ করে মা যাত্রা করলেন হরিদ্বারের পথে। ডেরাডুন এক্সপ্রেসে করে। আগামী ২রা মে মায়ের জন্মোৎসব সুরু হবে। হরিদ্বারে। যোগীভাইয়ের বাড়িতে। যোগীভাই হলেন সোলনের রাজাসাহেব। মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী পূর্বেই এসেছেন। অবধূতজীর ইচ্ছায় চারজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্গা সপ্তসতী পাঠ সুরু হলো। ঘট স্থাপনা করা হয়েছে। সেখানেই পূজা হচ্ছে। অবধূতজীই নিজে মাকে একটু সময়ের জন্য সেখানে নিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ যোগীভাইকে দিয়ে বেদধ্বনি সহ শ্রীশ্রীমা'র পূজা করালেন। মায়ের আরতিও হলো।

বম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরিজীও মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। সৎসঙ্গে ধর্মালোচনা করলেন কিছু সময়। আনন্দময়ী মা বম্বেতে তাঁর আশ্রমে প্রায় পনেরো দিন ছিলেন। মাকে বললেন, অনেকদিন ধরেই তাঁর মাকে দর্শন করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এতদিন সুযোগ ও সময় হয় নাই। আজ সময় হয়েছে বলেই এসেছেন। আরও সৌভাগ্য যে বদ্রীনাথ যাত্রার ঠিক পূর্বে মার দর্শন পেয়েছিলেন আবার ফিরবার পথেও মার দর্শন লাভ হলো।

রামকৃষ্ণ মিশন হতে দুইজন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীমা'র দর্শনের জন্য এসেছেন। তাঁরা মা'র কাছে প্রার্থনা করলেন,—মা, আপনার কাছে এসেছি। আশীর্বাদ করুন। এই পথে থাকা ত বড় কঠিন।

—হ্যাঁ, কঠিন ত ঠিকই। তবে তাঁর আশীর্বাদ সর্বদাই আছে মনে রেখো। প্রত্যুত্তরে মা বললেন।

আনন্দময়ী মা'র জন্মোৎসবকে উপলক্ষ্য করে শুধু যোগীভাইয়ের প্রাসাদই নয়, সমগ্র হরিদ্বারই যেন মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। উষাকীর্তনের পর সৎসঙ্গ সুরু না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা অখণ্ড কীর্তন রক্ষা করছেন।

এস এস ভাই আজি শুভদিনে গাও হে মঙ্গল গান।
গাও আনন্দময়ীর জয়, হয়ে সবে একতান।
উৎসব-বারতা করিয়া বহন, সুর-তরঙ্গের ছুটে সমীরণ
নদীর কল্লোল, সাগর হিল্লোল, গাহে মায়ের যশোগান।

বিশ্ব-দুঃখে হইয়া কাতরা, এসেছেন নেমে ভব-দুঃখ-হরা
বরষি স্নিগ্ধ করুণার ধারা করিবেন জীবে পরিত্রাণ ;
আবার গাও, আবার গাও আনন্দময়ীর জয়গান।

*　　*　　*

ডাক, বল গাও ভজ জপ মা মা মা।

*　　*　　*

এসেছ যদি মা,　　　ভুল না করুণা
নিয়ে পদ বন্দনা
(কব) আনন্দ প্লাবিত জীবন।

*　　*　　*

ডেবাডুন ও দিল্লীর ভক্তরাও এসেছেন। শিব মন্দিরটির চতুর্দিক সাজিয়ে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাম হচ্ছে। অখণ্ড নাম কীর্তন। গৌর হরি বোল, গৌর হরি বোল,······রাম নারায়ণ হরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 'মা' নাম কীর্তনও হচ্ছে। বালক বৃদ্ধ নারী নৃত্য করতে করতে নাম গান করছেন। মাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ মধুর স্বরে 'মা' নাম কীর্তন করতে লাগলেন। কি সে ভাব! কি সে সুমধুব কণ্ঠস্বর! এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সমবেত ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ করে তুললো। ক্রমে ক্রমে বহু ভক্তের সমাগম হচ্ছে। অনেকেই বড় বড় ফুলের মালা নিয়ে ছুটে আসছেন। মাকে ছুঁইয়ে প্রসাদী মালা করে নেবেন বলে। কীর্তনে কীর্তনীয়াদেরও ভাব হচ্ছে। অশ্রু-কম্প পুলকে বিভাবিত হয়ে পড়ছেন অনেকেই। মা সকলেরই নিত্যস্বভাব জাগিয়ে দিয়েছেন। আনন্দময়ী মার স্বরূপই হচ্ছে জীবের নিত্য-স্বভাব-জাগান স্বরূপ! ঝারিখণ্ড পথে শ্রীবৃন্দাবন যাবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গও পশুপক্ষী ব্যাঘ্র হস্তী হরিণ শূকরাদির নিত্য-স্বভাব জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারা হরিনামের ধ্বনিতে নৃত্য করতে করতে গৌরসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল।

এমনই গৌরসুন্দরের ছিল মহিমা! শ্রীশ্রীমারও আজ সেই গৌরাঙ্গ ভাব। দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছে। অপূর্ব মুখশ্রী। মধুর চাহনি। গদ গদ ভাব। বিগলিত হৃদয়। কীর্তন সমাপ্ত হলে মা বলেছিলেন, 'আরে মা কি শুধু এইটুকু? মা যে জগৎমাতা! এই শরীরটাই কি শুধু মা?'

এই বিশ্বসংসার যিনি রচনা করেছেন, মায়ার জিনিস তিনিই চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন! মানুষের মন ভোলাবার জন্য। সংসারে কাম-কাঞ্চনের মধ্যে থাকতে থাকতে আর মান-হুঁস থাকে না। কেমন যেন নিস্তেজ নিশ্চেতন হয়ে পড়ে। কামনা থাকলেই যে বন্ধন। তাই তো সকাতরে প্রার্থনা সেই ঈশ্বরের কাছে। শক্তিময়ী জননীর কাছে। মা—মাগো! তুমি সরিয়ে দাও মায়াকে। সরিয়ে দাও ছলনাকে। তুমি যার তাকেই দেখতে দাও শান্তিতে। মেঘ হয়ে ঢেকে রেখো না সূর্যকে। ধূলি হয়ে আকাশকে। তুমি উড়ে যাও। দূরে যাও। তুমি ভুল হয়ে থেকো না। ভুলকে যেন পারি ফুলে পরিণত করতে। আর সেই ফুলটিকে যেন তোমার চরণে দিতে পারি। অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দাও মলিন কামনাকে। সঞ্চয়কে। অহঙ্কারকে। আমরা যে ব্রহ্মময়ীর সন্তান। এই বোধই আমাদের প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে দাও। অনুভব করিয়ে দাও। এনে দাও ভাবের বন্যা। ঘুচে যাক স্বার্থের শৃঙ্খল। অহঙ্কারের নাগপাশ। আমাদের কর তুমি মৃদুগন্ধ শুভ্র-মল্লিকা ফুল। স্বর্গীয় বিভূতিদ্বারা প্রদীপ্ত করুণাময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তবৃন্দ যেন এই প্রার্থনাই জানিয়েছিল আনন্দময়ী মা'র চরণে।

জন্মোৎসব উপলক্ষে অগণিত সাধু সমাগম হয়েছে। মাকে ঘিরে হরিদ্বার নেচে উঠেছে। মেতে উঠেছে। সাধুদের ভাণ্ডারা হলো। প্রায় ছয়শত সাধু ভোজন করলেন। পাঁচজন মণ্ডলেশ্বরও ছিলেন। স্বামী মহাদেবানন্দজী, প্রেমপুরীজী, পরমানন্দজী,

ভাগবতানন্দজী ও পূর্ণানন্দজী। মণ্ডলেশ্বরদের বিধিমত পূজা আরতি মালা চন্দন ও দক্ষিণা দান হলো। উদয়াস্ত আনন্দ উৎসব চলেছে,...আনন্দ...আনন্দ...আর আনন্দ...। আবার উদাসী, গরীবদাসী ও নিরাকারী সাধুদেরও ভাণ্ডারা হলো। প্রায় সাড়ে চারশত সাধু ভোজন করলেন ২৭শে মে। আর মণ্ডলেশ্বরদের মধ্যে স্বামী অসঙ্গানন্দজী, ব্রহ্মানন্দজী, অবধূত মণ্ডলীর মোহন্ত আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাধু এসেছেন। যেমন সাধুদের ভাণ্ডারা হচ্ছে, তেমনই চলেছে অখণ্ড নামকীর্তন। সন্ধ্যার পর কীর্তন সমাপ্ত হলে মেয়েরা আবার নাম ধরলো। রাত্রিতে মেয়েদের নাম চললো। হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের মেলায় সকাল সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠেছে আনন্দময়ী মাকে কেন্দ্র করে। আবার সৎসঙ্গও চলছে। বড় বড় মহাত্মারা এসেছেন। ভাষণও দিচ্ছেন। গীতা ভাগবত উপনিষদ বেদ পুরাণকথা নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। আছেন স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, অসঙ্গানন্দজী, গঙ্গেশ্বরানন্দজী, বম্বের স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, বৃন্দাবনের অখণ্ডানন্দজী, শরণানন্দজী। এলাহাবাদ থেকে এসেছেন শ্রীযুত গোপাল ঠাকুর। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী ও চক্রপাণিজীও।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। অবধূতজী বৃন্দাবন থেকে লোক এনেছেন সাজানোর জন্য। শিবের মন্দিরের সামনের বাঁধানো জায়গায় ফুল দিয়ে মণ্ডপ করা হয়েছে। অপূর্ব হয়েছে দেখতে। অবধূতজী শ্রীশ্রীমাকে অনুরোধ করলেন সেই ফুলের মণ্ডপে বসবার জন্য। মা অগত্যা গিয়ে বসলেন। কারণ মা কখনও মহাত্মাদের কথা ফেলেন না। সেই ফুলের মণ্ডপের মধ্যে মাকে অপরূপা দেখাচ্ছিল। স্বর্গীয় আভায় বিভূষিতা জগজ্জননী আনন্দময়ী মা যেন স্বর্গ হতে মর্ত্যধামে অবতরণ করেছেন। স্বয়ং ভগবতী অধিষ্ঠিতা হয়েছেন ঐ ফুল মণ্ডপে। ভগবৎশক্তির পূর্ণ প্রকাশ তাঁর অন্তরে বাইরে। বিশ্বভুবনরূপে ফুটে উঠেছেন

বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। তিনি পূর্ণমাত্রায় জাত। স্থিত। পরিচালিত। ভগবতীরই লীলায়নে। ভগবতীরই লীলায় তিনি লীলায়মান। ভগবচ্ছন্দে ছন্দোময়। ভগবদ্‌ভাবে ভাবময়। ভগবদ্‌গতিতে গতিময়। তিনি যে লীলানন্দে বিভোর। ছিন্নভিন্ন হয়েও তাঁর আনন্দ। স্বচ্ছ থেকেও তাঁর আনন্দ। জীবদেহের সুখ দুঃখের প্লাবনের মাঝেও তিনি তৃপ্ত। স্থির। আত্মস্থ। পরমাত্ম-শক্তির অসীম্ লহরে তিনি আত্মরমণ বিভোর। তাঁর আনন্দলীলায় তিনি যে আনন্দ-নর্তনময়। স্বপ্নাবস্থার জাড্য তাঁতে আর নেই। তিনি আর অভিভূত ভোক্তা নন। পূর্ণ জাগ্রত ভোক্তা। ভগবদ্‌বিভূতিতে বিভূতিময় আপ্তকাম। সকল আঁধার, সকল ছায়াময় সত্তাবোধ, সকল ব্রহ্মাণ্ড যেন প্রবিষ্ট হয়েছে তাঁরই আত্মার গহ্বরে।

সেই অনির্বচনীয় রূপ দর্শন করে মুগ্ধচিত্তে অবধূতজী শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন,—মা, একটু বসে থাকুন। সকলেই এই মাতৃমূর্তি দর্শন করুক।

আনন্দময়ী মার ভাবদেহ যে জগতের কল্যাণ, শান্তি ও অভ্যুদয় উপলক্ষ করে বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর প্রাণের পরিপূত আবেগ, আর্তিহরা অপরূপ করুণাস্নিগ্ধ জননীর বাৎসল্য জীব-হিতের জন্য বিশ্বময় বিস্তার করে তিনি যেন বিশ্বজননীরূপে বিরাজ করছেন। ভক্তবৃন্দ সেই মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ অভিভূত ও অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হলো।

রাত্রিতে মাকে ঘিরে ভক্তরা বসে কথা বলছেন। নানা কথা। নানা আলোচনা। যে যেভাব নিয়ে কথা বলছেন, প্রশ্ন করছেন, মা তাঁর সেই ভাবকে ঠিক রেখেই যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নকর্তার মনও ঠিকমত উত্তরটি পেয়ে আনন্দে ভরে ওঠে।

ভক্তপ্রবর পান্নালালজী (ডাঃ পান্নালাল I.C.S.) বলছেন,—একদিন কথা হচ্ছিল যে মার নিকট এসে মার করুণাধারা কেউ ঘড়া ভরে, কেউ ঘটি ভরে, কেউ বাটি ভরে, যার যেমন শক্তি নিয়ে যায়।

আর একজনের কিছুই পাত্র নেই। সে অঞ্জলীভরেই নিয়ে গেল। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব বয়ে গেছে।

মা অমনি হেসে হেসে বললেন,—হাতটি ত ভিজা ছিল?

মার মুখনিঃসৃত নিগূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরটি শুনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দও হেসে উঠলেন। সকলেই বললেন, কি সুন্দর কথা! গুরুপ্রিয়াদেবীও বলে উঠলেন কি সুন্দর কথা!

মা আবার বললেন, 'দেখ, এই কথা বলা হইতেছে না যে, সব ছাড়িয়া চলিয়া যাও। সব নিয়াই থাক। শুধু তাঁর নামের একটু আগুন জ্বালাইয়া রাখ। যত্ন করিয়া এই আগুনটুকু জ্বালাইয়া রাখিও। তাঁর ইচ্ছা হইলেই ঐ আগুনেই তোমার সব ময়লা জ্বালাইয়া তোমাকে শুদ্ধ করিয়া তাঁর নিকট নিয়া যাইবেন। তাঁকে সঙ্গে রেখেই সংসার কর।'

এই সংসারে সঙও আছে সারও আছে। সঙ হচ্ছে মায়া। সার হচ্ছে ভগবান। যিনি অসীম হয়েও মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন, তাঁকেই এই সীমিত জীবনেই রূপায়িত করে তোল। এইটুকুই তো সার! জীবনকে কর ঈশ্বরের সারানুবাদ। এই কথাই যেন মা ভক্তদেব বলতে চেয়েছেন।

সংসারীর দায়িত্ব কি কম? কত দৈন্য, কত দায়, তারই মধ্যে ঈশ্বরের দিকে মুখ খোলা। ক্লেশ নৈরাশ্য লজ্জা লাঞ্ছনা সব কিছু সহ্য করে সব কর্তব্য পালন করে, এক হাতে কর্ম করা অপর হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকা। হাতে কাজ, মুখে নাম। যতই ঈশ্বরের দিকে এগুনো যাবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে আসবে। কাজ করে করে বন্ধন কাটানো। যখন বন্ধন কেটে যাবে তখনই আসবে প্রেম। নির্বন্ধন প্রেম। তখনই আসবে নৈষ্কর্ম্য। বৈরাগ্য। আকাঙ্ক্ষার কোমলতার সঙ্গে ত্যাগের কাঠিন্য। অনুরক্তির সঙ্গে অনাসক্তি। ভোগে দাসত্ব, ত্যাগে স্বাধীনতা। গ্রন্থি শিথিল করে দেওয়ার নামই ত্যাগ। ত্যাগ তো শূন্যতার শুষ্কতা নয়, পূর্ণতার

অভিষেক। তুমি আমার শূন্যের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে ওঠো। এই প্রার্থনাই যেন ভক্তরা জানাচ্ছেন আনন্দময়ী মা'র কাছে।

রাত্রি প্রায় বারটায় মা'র পূজা আরম্ভ হলো। ৩১শে মে। মা ছাতের উপর শুয়েছিলেন। শ্রীগোপাল ঠাকুর মাকে সঙ্গে করে নিচে নিয়ে এলেন। মাকে ফুলের মণ্ডপের মধ্যে যে বিছানা পাতা ছিল তারই উপর শুইয়ে দেওয়া হলো। অগণিত ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা আরম্ভ হলো। নাম গান—কীর্তনও চলছে। ভক্তরা যেন নিজ হৃদয়ের অনুরাগের অশ্রুবিন্দুকে পূজার ফুলে আর সঙ্গীতে পরিণত করে মায়ের চরণে নিবেদনের পথ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তাদের হৃদয় যেন বলে উঠছে—'শ্যামবন্ধু চিত নিবারণ তুমি !—কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে, পাসরিতে নারি আমি ! মোদের কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ কানু ! সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি।'

ভোর চারটায় পূজা শেষ হলো। মা ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। নিশ্চল, স্থির। দেখে মনে হয় সর্বভূত তাঁর মধ্যেই অন্তস্থ। সেই অগাধ প্রীতির সাগরস্বরূপ পরমাত্মা তাঁর বুকেই যেন স্থিত। সর্ব গতিময় হয়েও সর্ব অয়ন। সর্বশক্তি প্রকটিত করেও গতিহীন নিরীহ অব্যয়। বিশ্বাকার প্রকাশ করেও নিরাকার। শক্তিবিকার রচনা করেও নির্বিকার। অসম শক্তিবিলাস যে তাঁরই বিলাস। বিশ্বমূর্তি যে তাঁরই মূর্ত প্রকাশ। সমস্ত ক্রিয়া যে সেই অব্যয়েরই ক্রিয়া। সমস্ত শক্তি অনুভূতির তলে তলে, সমস্ত ভাবানুভূতির মূলে মূলে, সমস্ত আমিও আমার বোধ প্রকাশের আশ্রয়রূপে, সেই পরমস্থিতি ঐ মায়েরই বক্ষস্থলে। তাই তো ভক্তপ্রাণ বলে উঠছে, ওগো বিশ্বজননী, তুমি না বুকের ভিতর বলে উঠলে, আমার যে কিছুই উপলব্ধি হয় না। আমার উপলব্ধি মানেই যে তোমার বলা। আমার অস্তিত্ববোধ, আমার উপলব্ধি, আমার দৈনন্দিন জীবনের

ভোগ, সে যে তোমারই জানিয়ে দেওয়া। তোমারই প্রেরণ করা। আমার অন্তরে বসে তুমি দেখালে তবে ত আমি দেখবো! তুমি জানালে, তবে তো আমি জানবো। তোমাকে দেখা, তোমাকে জানা, তোমাকে উপলব্ধি করা মানেই তো তোমার অনুভূত মূর্তি। তুমিই আমার আত্মীয় আত্মশক্তি! অবিকল্পযোগে নিত্যযুক্ত! তুমিই আবার বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা!

তিন

'ভব নদী পার হবে যদি
নাম কর সার
মনরে আমার।
হরি নামের তরী নিয়ে
চল্ না রে ভাই বেয়ে বেয়ে।
গুরু যে তোর কর্ণধার (ও মন)
করে দিবেন ভব পার।
হরি নামের তরী নিয়ে বেয়ে চল্ বেয়ে চল্,
হরি নামের সারি গেয়ে ধেয়ে চল্ ধেয়ে চল্।'

'আনন্দময়ী মা গুন্ গুন্ করে গান করছেন। রায়পুর আশ্রমে। মৌন-মন্দিরের প্রবেশ উৎসব উপলক্ষে এসেছেন। যমুনালাল বাজাজজী আশ্রম করে মায়ের কাছে থাকবেন বলে জমি কিনেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী জানকীবাঈ কন্যাপীঠের নামে তা দান করে দিয়েছিলেন। ঐ জমির উপরই পণ্ডিত পরশুরামজী ওঁর ছেলের স্মৃতিকল্পে একটি বাড়ি তৈরি করে অর্পণ করেছেন। ভাইজীর* ইচ্ছা ছিল ঐ স্থানেই পাহাড়ের উপর একটি 'মৌন-মন্দির' হয়। ভাইজীর ঐ ইচ্ছার কথা শুনে পরশুরামজী একতলা আশ্রমের উপর একটি 'মৌন ঘর'ও নির্মাণ করেছেন। শ্রীশ্রীমা সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। যজ্ঞ হলো। পরশুরামজী মায়ের পূজা করলেন। পাঠ ও কীর্তন চলেছে। স্বামী চিন্ময়ানন্দকে ঐ

*ভাইজীর নাম জ্যোতিশচন্দ্র রায়। সন্ন্যাস নাম মৌনানন্দ পর্বত। শ্রীশ্রীমায়ের পরমভক্ত। মাকে উদ্দেশ্য করে বহু সঙ্গীত রচনা করে মায়ের শ্রীচরণেই অর্পণ করেছিলেন।

মৌন ঘরে বসে দীর্ঘ সময় ধরে জপ ধ্যান করতে বললেন শ্রীশ্রীমা। মা নিজেও ভাবানন্দে বিভোর। নিরালায় বসে আপন মনে গান করছেন। আনন্দময়ী মা'র সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত অপরূপ ধ্বনি-সঙ্গীত মাতৃদুগ্ধের তরঙ্গের মত ভক্তদের অন্তরকে যেন স্নিগ্ধধারায় অভিষিক্ত করে দিল। বাতাস মধুরতায় আর্দ্র হয়ে যায়। কোথায় তলিয়ে যায় দুঃখের ভার। ফুলের মত যেন হেসে ওঠে অন্তর। মুক্তির শ্বাস ফেলে নিঃশব্দে সে আবার প্রবেশ করে তার স্বপ্নলোকে।

সে সঙ্গীত শুনে গুরুপ্রিয়াদেবীর মনও স্বপ্নলোকে চলে যায়। মুগ্ধচিত্তে লিখে রাখেন সঙ্গীতটি। ভবিষ্যতে মায়ের সব ভক্তদের উপহার দেবার জন্য। মা সবই বোঝেন। কিছু বলেন না। শুধু মৃদু মৃদু হাসেন।

রায়পুর আশ্রমের লীলা সাঙ্গ করে মা যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের পথে। দিল্লী ও কানপুর হয়েই অবশ্য বৃন্দাবন যাবেন। কানপুরে এসে উঠলেন ভক্তপ্রবর ডাক্তার জগদীশপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। কানপুরে ভক্তদের সঙ্গে লীলা করে, চলে এলেন দিল্লীতে। দর্শন দিলেন মায়ের পুরানো ভক্ত ডাক্তার জে. কে. সেনকে। ডাক্তার সেন খুবই অসুস্থ। শ্রীশ্রীমা তাঁকে অভয় দিয়ে আনন্দ দিয়ে, দিল্লী শহরকে প্লাবিত করে, রওনা হলেন শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে, ভক্তপ্রবর নারায়ণ দাসজীর গাড়িতে করে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। মা এসে পৌঁছলেন বৃন্দাবন ধামে। শ্রীশ্রীহরিবাবার বিশেষ আগ্রহে। আমন্ত্রণে। ঝুলন পূর্ণিমার উৎসবকে উপলক্ষ করেই মায়ের বৃন্দাবনে আগমন। অধ্যাপিকা গঙ্গাদিদিও আছেন। তিনিও ঝুলনের আয়োজনে ব্যস্ত। মাকে অপরূপ সাজে সাজানো হলো। সুরু হলো কীর্তন। মাকে ঘিরে কৃষ্ণকীর্তন সুমধুর কণ্ঠে হতে লাগলো। কি অপরূপ! মোহনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। সেই কৃষ্ণকীর্তনে অতীতের বৃন্দাবনের বহু স্মৃতি যেন আপনা হতে সকলের অন্তরে জেগে উঠতে

লাগলো। সে শব্দ-সঙ্গীতে ঝরে পড়ে যুগযুগান্তের পুরানো বৃন্দাবনের স্মৃতি। শ্রীরাধার কত না বেদনা-অশ্রু, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর করুণ সুরধ্বনি। ঐ বাঁশীর কলগীত শুনে, প্রাণস্পর্শী আহ্বানে ব্রজগোপীগণ একদিন কৃষ্ণগৃহীত মানস হয়ে কৃষ্ণদর্শন লালসায় যমুনা-পুলিনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। ঐ বংশীধ্বনি সেদিন ব্রজগোপীদের হৃদয়ে অঙ্কুরিতভাবে অবস্থিত ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেমরূপভক্তিকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল। অনাবিল ঈশ-সৌন্দর্যের অনুভূতি লাভ হয়েছিল। সেই প্রাচীনকালের শ্রীকৃষ্ণ-রাধা ও ব্রজগোপীদের লীলাবিলাসের সাক্ষী ছিল যমুনা-পুলিন। শ্রীযমুনা। কৃষ্ণকীর্তনের মধ্য দিয়ে আজও যেন সেই প্রেম-যমুনার বক্ষ হতে নিঃসৃত বাতাস ভক্ত হৃদয়ে দেয় দোলা। হৃৎস্পন্দনে বাজে যেন সেই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরধ্বনি। সেই স্পর্শের সুরধ্বনি ঢেউয়ে ভেসে ভেসে ভক্তের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, বৃন্দাবনের মাঠ ঘাট প্রান্তর দিয়ে ফুলের রঙে, পাখির কাকলীতে যমুনার কলরবের মধ্য দিয়ে যেন বলছে, আমি আছি। আমি আছি। আমি আছি। আমি তো একা একা বাঁচি না। সবাইকে নিয়ে বাঁচি। তাই সবাইকেই ডাকছি তোমরা শোনো! শোনো! ভুলো না আমায়। তোমরা বিষয়কে আশ্রয় করো না। আশ্রয় করো আমাকে। আমি যে নাম! কৃষ্ণ নাম! জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই নামমন্ত্র সর্বদাই অনুরণিত হচ্ছে। নাম যে হয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত হচ্ছে। নাম করা নয়। নাম হয়। তোমরা শুধু শোনো। শুধু শোনো। আমি যে অনন্ত এ কে না জানে! তুমি একবার আমার একান্ত হও। এ যেন ভগবান আকুল হয়ে ডাকছেন ভক্তকে। মানুষ যে সংসার-মায়ামুক্ত, অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন অনুরাগী শত চেষ্টাতেও হতে পারছে না। সংসাররূপ মৃগতৃষ্ণা কেউ যে এড়িয়ে যেতে পারে না। সাধনালব্ধও নয়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায়ই সম্ভব। তাই তো শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীধ্বনি আহ্বান গীত অবিরাম চলেছে।

আজ ঝুলন পূর্ণিমার তিথি। শ্রীশ্রীমায় স্বতঃস্ফূর্ত দীক্ষা এই দিনটিতেই হয়েছিল। সে সময়টা রাত্রি ১১॥টা হতে ১২॥টা পর্যন্ত। ঐ সময়টা ভক্ত শিষ্যরা বিশেষভাবে পালন করেন। ঐ সময়টা উত্তীর্ণ হলে মা ভক্তবৃন্দসহ চললেন হরিবাবার আশ্রমে। পথে মদনমোহনজীর মন্দির, সনাতন গোস্বামীর প্রাচীন স্থান, কালীয়দমন হ্রদ, গোবিন্দজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করলেন। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিতে বৃন্দাবনের পথে পথে মা ভক্তসনে লীলা করে চললেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা মায়ের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ছিলেন। অবশেষে মাকে পেয়ে হরিবাবা ও আশ্রমের সকলেই আনন্দিত হলেন। হরিবাবার আগ্রহে ভক্ত মনোহর নানা ফুলের সাজ এনে দিলেন। গঙ্গাদিদি মাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে দিলেন। সকলের বিশেষ আগ্রহে মা ঝুলায় গিয়ে বসলেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা নিজেই মাকে দোল দিলেন, মায়ের আরতি করলেন। দুই দিকে রাধা-কৃষ্ণ, মাঝখানে মায়ের দোলনা। শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভোর হয়ে, মা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। ভাবস্থ। ভাব-সমাধি। শ্রীরাধারাণী নয়, এ যেন গোকুলের আনন্দকন্দ নন্দদুলাল উৎসাহানন্দের আধার! যেন প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দোলায় বসে দোদুল দুলছেন। শুধু যশোদার আনন্দের ধন নয়, সমস্ত গোকুল-বাসীদেরই আনন্দের ধন। বাৎসল্যের আধার। ঝুলন উৎসব যে বাৎসল্যরসেরই উৎস ও আধার। আর আনন্দময়ী মা যেন সেই বাৎসল্যরসের বন্যাপ্রবাহ। সেই প্রেম-রসে আপ্লুত হয়ে ভক্তদের মন প্রাণও দিব্যানন্দে বিভোর ও প্রমত্ত হয়ে উঠলো। আরতির পর ভক্ত ও দর্শনার্থীর প্রণামের ভীড় পড়ে গেল। এই ভাবে ভক্তসনে লীলা করে শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন বারাণসীধাম অভিমুখে।

'কৃষ্ণ কাহ্নাইয়া বংশী বাজাইয়া…'। এই একটি পদকেই আনন্দময়ী মা সুমধুর কণ্ঠে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন। ঝুসীতে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে। ঠিক আশ্রমে নয়, আশ্রমের অনতিদূরে গোচারণ ক্ষেত্রে। আমগাছতলায় বসে। প্রভুদত্তজী গো-সেবা ব্রত নিয়েছেন। আশ্রমে প্রায় শতাধিক গরু আছে। যেখানে গরু থাকে সেখানেই একখানি ছোট ঘরে থাকেন। বিগ্রহও সেখানে নিয়েছেন। মাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাই এলাহাবাদ থেকে কাশী যাওয়ার পথে মা ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে এসেছেন। মার সঙ্গে আছেন গুরুপ্রিয়াদেবী আর ডাঃ পান্নালালজী। সেই মাঠে, গোচারণ ক্ষেত্রেই প্রভুদত্তজী মাকে অভ্যর্থনা করলেন। আসন বিছিয়ে দিলেন। মাও আগ্রহ সহকারে আসন গ্রহণ করলেন। ওখানেই ভক্তপ্রবর পান্নালালজী মাকে অনুরোধ করলেন গান করতে। মাও গোচারণ ক্ষেত্রে বসে কৃষ্ণকীর্তন, 'কৃষ্ণ কাহ্নাইয়া' সঙ্গীত শুরু করলেন। যেমন পরিবেশ তেমনি ভাব, তেমন সঙ্গীত! আনন্দময়ী মা'র কণ্ঠ হতে উৎসারিত সেই কৃষ্ণ গুণগান ভক্তহৃদয়কে প্লাবিত করে নিয়ে চললো কোন্ এক পরম পরিতৃপ্তির জগতের দিকে। এই মানুষী জীবনেরই সব অশ্রু অনুরাগ আর আকুলতার উপহার নিয়ে গোপীহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণপ্রেমে লীন হবার জন্য ছুটে গিয়েছিল যে পথে। যে জগতের দিকে। ব্রহ্মচারীজী ও পান্নালালজীব দুই চক্ষুও জলে ভরে উঠলো। ক্ষণিকের জন্য তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসাকে মিটিয়ে দিল যেন শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত। মনের মাটিকে সিক্ত করে তুললো কৃষ্ণপ্রেমরসামৃত সিন্ধু।

গরুগুলিও গানের আকর্ষণে এক এক করে এসে আনন্দময়ী মাকেই ঘিরে একত্রিত হয়ে দাঁড়ালো। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। স্থান কাল পাত্র সবই মধুর। মধুর মধুর কৃষ্ণনাম। এমন মধুমাখা কৃষ্ণনাম গোরা কোথা হতে এনেছে। এ নাম

একবার শুনে আমার হৃদয়বীন আপনি বেজে উঠেছে। কৃষ্ণরূপ সদাই পড়ে মনে। আমি ভুলিতে যতন করি বেদনাতে মরি প্রাণে। দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবেশী, তবু কৃষ্ণ ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে। কৃষ্ণ লাগি এত জ্বালা তবু সে মোর জপমালা কি গুণ করেছে কৃষ্ণ হেল হল কুল মানে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর প্রভাবে উপস্থিত সকলেই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হলেন। এইভাবে দুপুর গেল, বিকেল গেল। ধীরে ধীরে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা এসে পড়লো মায়ের শ্রীমুখে, শ্রীঅঙ্গে। আর দেরী নয়, সকলেই উঠে পড়লেন। মা আবার যাত্রা করলেন কাশীধামের পথে।

চার

কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম ভাগবত পারায়ণ* উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তরা এসে সমবেত হয়েছেন। সকালে পাঠ হচ্ছে আর বিকালে চারটা থেকে হচ্ছে ব্যাখ্যা সুরু। রাত্রে মৌনের পর শ্রীশ্রীমা ছাদের উপর বসেন। বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে। গোপীনাথ কবিরাজ, পান্নালালজীও আসেন। নানা কথা নানা আলোচনার এক আসর বসে। মাকে নিরিবিলি এমন একান্তে পাওয়াও তো যায় না! হঠাৎ মা অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকাতেই, ভক্তপ্রবর পান্নালালজী জিজ্ঞেস করলেন—মা, কেহ এসেছেন কি.?

—কেন একথা জিজ্ঞেস করছো? তোমাদের কিছু মনে হচ্ছে কি? মা জিজ্ঞেস করলেন অন্যান্য ভক্তদের।

—না। সকলেই বললেন।

—আমার যেন মনে হলো কোন মহাপুরুষ এসেছেন। পান্নালালজী বললেন।

এবারে মা গোপনে গুরুপ্রিয়াদেবীকে কিছু বললেন। অর্থাৎ আভাস দিলেন সমস্ত ব্যাপারটি গোপন রাখবার। পান্নালালজীর কৌতূহলের পরিসমাপ্তির জন্য আনন্দময়ী মা এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনার কথা উত্থাপন করলেন। পান্নালালজীর প্রশ্ন ও কৌতূহল একেবারে ভ্রান্ত নয়। মা মাঝে মাঝেই সূক্ষ্মে মহাত্মাদের দর্শন লাভ করেন। আবার কোন কোন ভক্তকে মা স্বয়ং সূক্ষ্মে দর্শন দানও

*পারায়ণ অর্থ=পুরাণাদি গ্রন্থের সমগ্র পাঠ। ভাগবত পারায়ণ অর্থ ভাগবত সমগ্র পাঠ ও ব্যাখ্যা। (সম্পূর্ণতা)

করে থাকেন। দীক্ষাও দিয়েছেন। এমন অজস্র ঘটনা মায়ের জীবনে ঘটেছে। গুরুপ্রিয়াদেবীর ভাষায়, 'কয়েক বৎসর পূর্বের কথা, একজন ভদ্রমহিলার মাকে দেখার পর হতেই কি রকম যেন ভাবের পরিবর্তন হয়। কোন কাজই করতে পারেন না। এমন কি নিজের ছেলেকে দুধ দিতেও পেরে ওঠেন না। তখন নিতান্ত অসহায় বোধ করে তুলসীতলায় প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন, এ কি হলো? আমাকে ভাল কর। নইলে নূতন সংসার কি করে চলবে? আশ্চর্য, এর পর থেকেই পরিবর্তন দেখা গেল। সাত আট বৎসর পর আজই সেই মহিলাটি মার কাছে এসে সব কথা খুলে বলে গেলেন। মার সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। স্বপ্নেই নাকি বছরখানেক পূর্বে মা'র নিকট থেকেই দীক্ষা পেয়েছেন। স্বপ্ন দেখছেন,—মা'র সঙ্গে চলেছেন। মা চোখ ইসারা করে একদিক দেখাতেই তিনি দেখলেন নারায়ণশিলা। প্রণাম করলেন। তখনই মা তাঁকে দীক্ষার মন্ত্র দিলেন। সেই মন্ত্র এখনও তিনি নিয়মিত জপ করে যাচ্ছেন।'

ভক্তরা বুঝলেন, মা কখন কোথায় সূক্ষ্মে চলে যান তা কে বুঝবে? আর কত লোকে কত ভাবে যে মা'র কৃপা লাভ করছে তার খবর কে রাখে?

আবার একদিন।

মা কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা মরমী ভক্ত গঙ্গাদিদিকে বলছেন,— আজ ভাগবত সমাপ্ত হলো। আজ সকলে মিলে একটু রাত্রি জাগরণ করা হোক।

—ভাগবতের মাহাত্ম্যের মধ্যেও এই কথা আছে। বললেন গঙ্গাদিদি।

রাত্রে মাকে নিয়ে রাত্রি জাগরণ হবে শুনে ভক্তরা আনন্দিত হলেন। এদিকে মা'র নির্দেশ মত বেলতলায় ছোট একটি বেদী তৈরি করা হয়েছে। বিরজা মন্দিরের মধ্যে একটি বড় শ্বেত প্রস্তর

রাখা ছিল। তাই ঐ বেদীর উপর পাতা হয়েছে। তার উপর একটি মন্দিরের চূড়ার মত বানানো হয়েছে। কি উদ্দেশে এসব হলো মা-ই জানেন। রহস্যময়ী মায়ের রহস্যের কি শেষ আছে ?

সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হলো। ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। শ্রীশ্রীমা ভক্তদের নিয়ে ছাতে বসলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রাণ গোপীনাথ কবিরাজও মায়ের কাছে এসে বসলেন। তিনিও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে কাটাবেন। ধীরে ধীরে মেয়েরা মাতৃসঙ্গীতে মুখর করে তুললো আনন্দময়ী আশ্রম। শিবলীলাভূমি কাশীর আকাশ বাতাস।

এসেছে আনন্দময়ী আনন্দ-নন্দিত ভুবন
প্রমোদে প্রণয়ে বিলাসে হরষে
ভূতলে রচিত নন্দন।
আনন্দ আকুল বায় তটিনী নাচিয়া ধায়
সাগর সঙ্গীত গায়
নির্মল সুনীল গগন।

* * *

আনন্দ জলধিনীল, আনন্দ গগনতল, আনন্দ বায়ু-হিল্লোল,
আনন্দ ভুবনময় ;
আনন্দ নিকুঞ্জবনে, আনন্দ তটিনী সনে, আনন্দ
মধুপগানে—
হৃদয় পাগল হয়।
আনন্দে গাহিছে পাখী, আনন্দে নাচিছে শাখী, আনন্দে
মেলিয়া আঁখি
সুহাসে প্রসূনচয়।
নাচিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া

ভুলিয়া দুঃখ, তুলিয়া বাহু — নাচ আনন্দে প্রেমানন্দে,

প্রিয় সঙ্গে প্রেমরঙ্গে—

গাহ মা আনন্দময়ীর জয়।

* * *

অনন্ত জগৎও সেই রাত্রির আকাশে নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো মাতৃসঙ্গীত। আনন্দময়ী গীতিকুঞ্জ হতে উত্থিত মধুর কীর্তন সঙ্গীতধ্বনি অসীম অনন্ত আকাশের বুকে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ভক্ত-হৃদয়ের সঙ্গীত পরিপূর্ণ করে তুললো চতুর্দিক। শুধু আনন্দময়ীর সভাকে নয়, যে সভার মধ্যে অনন্ত কোটী জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত সেই অসীম আকাশকেও। ভক্তকণ্ঠের আবেগমধুর সঙ্গীত শুনে আনন্দময়ী মা'র চোখ ছল ছল করে ওঠে। অদূরে গঙ্গার জলও টলমল করে। একটা কম্পমান রেখার মত। কম্পমান নয়, স্পন্দন। স্পন্দন জেগেছে গঙ্গা নদীর তরঙ্গেও। অনুরণিত হচ্ছে তরঙ্গে তরঙ্গে। আর অস্পষ্ট এক মাতৃসঙ্গীতের সুরলহরী যেন ভেসে আসছে নদীর বক্ষ হতে।… …আনন্দ সৃজন লয় বল আনন্দময়ীর জয়। কল্লোলিনী গঙ্গার তরঙ্গধ্বনি নয়, আনন্দময়ী নাম কীর্তন করতে করতেই নদী তার প্রবাহধারাও ভুলে গিয়ে এখানে হয়েছে উত্তরবাহিনী। কাশীধামে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী। কি বিচিত্র লীলা! সৃষ্টিকর্তাও হাসেন তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখে। ভক্তরা তখনও মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে বসে আছেন শ্রীশ্রীমার কাছেই। তাঁরা যে মায়ের সঙ্গ করছেন। রাত্রিও ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগলো।

রাত্রি পোনে বারটার সময় মায়ের নির্দেশ মত মায়ের প্রদত্ত নূতন বস্ত্র পরিধান করে নারায়ণ স্বামী এসে বসলেন সেই বেদীর উপর। স্থিরভাবে আসন করে। গুরুপ্রিয়াদেবী ধূপ কর্পূর চামর দিয়ে শিবজী, নারায়ণ স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীমা ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে যেখানে বসেছেন তার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আরতি করতে

লাগলেন। সুস্বরকণ্ঠে বেদমন্ত্রধ্বনিও উচ্চারিত হতে লাগলো। বেদ পাঠ করছেন অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত অগ্নিস্বত্তা শাস্ত্রী (বাটুদা)। এক অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশের হলো সৃষ্টি। নারায়ণ স্বামী তখনও নিস্পন্দ হয়ে আসনে সমাসীন। বেদ পাঠ শেষ হলে মেয়েরা আবার গান শুরু করলো।

গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব।
শঙ্কর প্রকাশ ওহে মহাযোগী,
অনাথের নাথ ওহে মহাযোগী
পরম দয়াল ওহে মহাযোগী,
অহেতু কৃপাল ওহে মহাযোগী,
অধম তারণ ওহে মহাযোগী।

ভক্তিমতী মেয়েদের অপূর্ব ভাবপূর্ণ সুকণ্ঠস্বর অনির্বচনীয় এক ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করলো। গভীর রজনীতে। আবার সে রাত্রিরও হলো অবসান। ধীরে ধীরে প্রভাত সূর্যের স্বর্ণকিরণ এসে আশ্রম প্রাঙ্গণে, মন্দিরে ছাতে নৃত্য করতে সুরু করে দিল। অন্নপূর্ণা মন্দিরে মেয়েদের ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা উঠলো বেজে। ভক্তরা সকলেই মাকে প্রণাম করে উঠে গেলেন।

'—তিনটা দিন ত চলুক', মা বললেন সকলকে। এইভাবে মায়ের নির্দেশে তিন রাত্রি ধরেই এই 'রাত্রি জাগরণ উৎসব' চললো। ঐ সব রাত্রি জাগরণ এবং পূজা আরতির কারণ কি? মা-ই জানেন মায়ের রহস্যলীলা।

* * *

আবার নানা কথা নানা আলোচনা। মায়ের ঘরে অনেক ভক্তই রয়েছেন। কেহ কেহ স্বপ্নে—অলৌকিকভাবে মায়ের মুখ থেকেই বীজ বা মন্ত্রাদি পেয়ে যাচ্ছেন। এর রহস্যই বা কি? এই প্রশ্নই উঠেছে ভক্তদের নিকট থেকে। শ্রীশ্রীমা এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'দেখ,

এই শরীরে তো কোন সঙ্কল্পাদি নাই। এই শরীরটা কত সময়ই হয়ত আপন মনে আছে। হঠাৎ কত সময় নানা বীজ বা সন্ন্যাসের মন্ত্র সব মুখ দিয়া বের হয়ে আসছে। তখন হয়ত সে সব কেউ শুনে নিচ্ছে। আরও হয়ত নানা ভাবে কেউ কোনটা পেয়ে তাই ধরে নিচ্ছে। এই শরীরের কিন্তু সেজন্য দীক্ষা দেব বা কিছু, সেই সব দিকই নাই। হয়ে যাচ্ছে। বাবা, এমন এমন ঘটনা হচ্ছে যে সাধারণ লোকে একেবারেই স্থির করে নেবে যে নিশ্চয়ই পূর্বের কিছু ঠিক ছিল। কিছুই কিন্তু ঠিক ছিল না। যা হওয়ার তাই হয়ে যাচ্ছে। কেমন জান? যেমন মাটিতে আছেই। গাছ থেকে একটি ফল পড়ে তার থেকে গাছ উঠলো। কেউ বীজ কিন্তু লাগাল না। কিন্তু বীজ লাগালেও যেমন গাছ হত আপনি, ফলটি পড়েও ঠিক তেমনি গাছটি হবে। সেই গাছে ফল ফুলও এক রকমই হবে। অথচ কারও এইরূপ আগ্রহ বা সঙ্কল্পাদি কিছুই ত নাই। এই রকমই আর কি।'

মায়ের মুখনিঃসৃত উত্তরটি শুনে যে সমস্ত ভক্তের মনে অভিমান ছিল তার পরিসমাপ্তি হলো। অর্থাৎ যাঁরা মনে করতেন মায়ের কাছাকাছি ঘুরঘুর করেও আমরা কিছু পাচ্ছি না, কিন্তু দূর থেকে অপরিচিত একজন কিভাবে পেয়ে যাছে বীজ, মন্ত্র বা মায়ের কৃপা। শ্রীশ্রীমা সরল ভাষায় সহজ করে দিলেন কঠিন তত্ত্বকে। মা সর্বদাই ভক্তদের বলেন, 'যা হওয়ার তাই হয়ে যাচ্ছে।'

মন যে বড় চঞ্চল। এই বিষয়ের সংসারে থেকে চঞ্চল মনকে কেমন করে সংযত করা যায়? কি ভাবে ভগবৎমুখী করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মা বলছেন,—'প্রত্যেকটি কর্ম তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করতে হবে। নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে হবে না। এমন কি খাওয়া-দাওয়া, হাঁটা-চলা, দেখা-শুনা-বলা সব কিছু। জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম। তাঁর হাতের যন্ত্র এই শরীর দ্বারা যা

কিছু হচ্ছে এমনই ভাব নিয়ে, সবকিছু তাঁকে সমর্পণ করা। ভোর বেলা জাগরণের পর হতে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবটি রাখতে চেষ্টা করা। তারপর মনে মনেই তাঁর চরণ চিন্তা করে জপ কিংবা ধ্যানের ভাবটি সহ চরণের উপর নিজের মাথাটি লুটিয়ে দিয়ে সর্ব সমর্পিত ভাবটি নিয়ে শুইয়া পড়া। এইরূপ কবতে করতে ক্রমশঃ মনে আসবে যে লোভ ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ বস্তু তাঁকে দিব কি করে? তিনি যে আমার কত প্রিয়! আপন জন। প্রিয়জনকে কি খারাপ জিনিস দেওয়া যায়? এই ভাবতে ভাবতে আর খারাপ কাজ করাই সম্ভব হবে না। তারপর তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁর চবণে উজাড় করে দিলে, নিজের বলে আর কিছুই রইলো না। এই শুভমুহূর্তে তিনি কি করেন জান? তিনি তোমার এই অল্পত্ব পূর্ণ করিয়া দেন। তখন চাইবার, পাইবার আর কিছুই বাকী থাকবে না। যেই মুহূর্তে তোমার এই সমর্পণ সেই মুহূর্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ড পূর্ণত্ব তার প্রকাশ। আমার আমি নিজ বলিয়া যা, তাহা অর্পণ মানেই নিজেকে পাওয়া।'

ভক্তবৃন্দ মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করছেন মায়েব মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী। অন্য এক প্রসঙ্গ উত্থাপন হলো। গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন,—মা'র এক কাজের কিন্তু নানাদিক থাকে। মাও বলেন, 'একটি কাজের অনন্ত কারণ।' কাল হয়তো আজকের প্রসঙ্গ উঠলে বলবেন সম্পূর্ণ অন্য একটি দিক নিয়ে।

শ্রীশ্রীমা গুরুপ্রিয়াদেবীব কথা সমর্থন করে বললেন, 'অতি সত্যি কথা। সবটারই যে অনন্ত দিক আছে।'

গুরুপ্রিয়াদেবী আবার বলছেন, মা কখনও হয়তো বললেন, ঘটিতে জল আছে কি না দেখতে। গিয়া দেখা গেল জল আদৌ নাই। তখন আমাদের মনে হতে পারে যে মা বললেন অথচ ঘটিতে জল নাই? এর রহস্য কি? মা'র সব কথার অর্থ ত সব সময় বোঝা যায় না। ভক্তদের এই রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা প্রসঙ্গে মা-ই বলছেন:

—'এটা হল ব্যবহারিক ভাব। যদি প্রত্যেকটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক তাই হওয়ার হত, তবে ত তোমাদের সঙ্গে কোনও জাগতিক ব্যবহারই চলত না। তবে বাবা, মা, কেমন আছ—ইত্যাদি জিজ্ঞাসারই বা কি অর্থ? সেদিক দিয়া দেখলে ত সবই জানা। কথা বলারই কিছু নেই। এদিকে তোমাদের সঙ্গে সবটাই চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। একটা অবস্থা আছে, যখন হরিকথা ছাড়া মানে শুধু ঐ বিগ্রহের কথা ছাড়া অন্য সব বাজে কথা। কিন্তু আবার আর একটা স্তর আছে যখন সবই যে তিনিই। তিনি ছাড়া যে অন্য আর কিছুই নেই। রান্নার জিনিস বল, বিল্ডিংয়ের কাজ বল, যে কোনও কাজ বা যা কিছু বল তিনি ছাড়া আর যে কিছুই নেই। তিনি ছাড়া এটা—একথা বললে যে তাঁর সর্ব-ব্যাপীত্বে দোষ আসে। তিনিই সব। আর কিছুই নেই। তাই কোনও কথায় কোনও ব্যবহারেই বাধা আসে না। একই ভাব সর্বদা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে দিয়া তোমরা যখন যা হয় করিয়ে নেও। তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা-চলা কাজ-কর্ম।'

গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন অন্য এক প্রসঙ্গে। হরিদ্বারে মায়ের জন্মোৎসবে একজন গুজরাটি মেয়ে এসে মাকে বললো, মা, তুমি যখন বম্বেতে ছিলে তখন তোমাকে দেখতে রোজই যেতাম। তোমাকে যে খুব ভাল লাগে! অনেক লোকও অবশ্য আসতো। আমাকে ঐভাবে রোজ যেতে দেখে একজন স্বামীজী বলেছিলেন—ওখানে যাও কেন? ওখানে আধ্যাত্মিক বিষয় কিছু আছে নাকি? তান্ত্রিকমতে কত রকম বশীকরণ বিদ্যা আছে। ঐ রকম কিছু হবে।

আমার জন্য তাঁর যেন মহাচিন্তা। মা, তোমাকে যে বড় ভালবাসি। এই কথায় মনে বড় দুঃখ পাই। মা, সত্যিই কি তাই?

মা প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, এই শরীর তন্ত্র মন্ত্র কিছু করে না। এই শরীরে তান্ত্রিক ঐসব ক্রিয়া কাকে বলে, কি করে সে সবের কোনও বালাই নাই। তুমি বিশ্বাস কর, নিশ্চয় জানিও, সকলেই নিজের কাছে নিজে আসে। এখানে যে সকলের সঙ্গেই আত্মিক সম্বন্ধ। তোমরা কি এই শরীরটাকে কোন বিদ্যাও শিখাইয়াছ? যেখানে লেখাপড়ার বালাই নাই সেখানে আর এসব কি করিয়া হয়? এই শরীর ত বলে ছোট্ট মেয়ে বলিয়া সকলের আদর। আর এক কথা ত আছেই।—নিজের কাছেই নিজে আসা। এখানে ত আর আলাদা ঘর বাড়ি নাই। আর ঘর যদি বল সেই সীমাহীন একই। তান্ত্রিক বিদ্যার কথা তোমরা যাহা শুনিয়াছ একেবারেই ভুল। এই ছোট্ট মেয়েটার আলাদা বলিয়া কোথাও ত কিছু নাই। সব জায়গায় সব দিকে যা। এখন তোমরাই বিচার কর। তবে এই শরীরটার দ্বারা কখনও কাহারো অমঙ্গল হতেই পারে না। হবেই না।

মা এই কথার সম্মতি জানিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, সেবার মীরতলায় যশোদা মা'র সঙ্গে দেখা হল। এই শরীরটাকে নিয়ে কত আনন্দ করলেন। বললেন, আগে শুনে ভেবেছিলাম মা'র কাছে বুঝি তান্ত্রিকের ব্যাপার একটা কিছু হবে। এখন বুঝলাম তা তো না। দেখে এ ভুল ভাঙলো। কত আদর করে এ শরীরটাকে সব কথা বললেন।

ভক্তপ্রবর পান্নালালজী ও বৃদ্ধভক্ত সান্ন্যালবাবুও শ্রীশ্রীমার সঙ্গে নানা ব্যাপারে মান অভিমান করছেন। দুজনেরই বাৎসল্যভাব। সৎসঙ্গে মা ঠিক সময়মত উপস্থিত হতে পারছেন না তাইতে বৃদ্ধ সান্ন্যালবাবু অভিমানভরে বলছেন মাকে উদ্দেশ্য করে,—আমরা এখানে আসি কেন?

মাও রহস্য করে হেসে হেসে বলছেন, বাবা, কোথা হতে আস? কার কাছে আস? কোথায় আস?

সান্ন্যালবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে গম্ভীরভাবে বললেন,—আমরা অজ্ঞান হতে জ্ঞানের কাছে আসি। অন্ধকার হতে আলোর কাছে আসি, অবিদ্যা হতে বিদ্যার কাছে আসি।

মাও তৎক্ষণাৎ হাসতে হাসতে জবাব দিলেন,—বাবা, তুমি যখন এতই বোঝ তখন আর এ অভিযোগ করছো কেন? এত সব বলছো কেন?

পান্নালালজী বললেন, মা, তুমি এত দেরী করে আমাদের কাছে আস, তাই খারাপ লাগে।

—পিতাজী, তোমার তো দেখছি বিরহের ভাব। তুমি আর কিছু বলিও না। রহস্য করে বললেন মা।

সৎসঙ্গের আসর মায়ের রসিকতায়, রস ও রহস্যে আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠলো। শ্রীশ্রীমাকে ঘিরে আনন্দের হাট বসে গেল। কাশীর আশ্রমে। সৎসঙ্গে।

সৎসঙ্গ কি? মা বলছেন, স্ব মানে সেই ভগবান। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আত্মস্বরূপ যা বল। স্ব এর সঙ্গ। স্ব-অঙ্গ অর্থাৎ স্ব-ই একমাত্র স্বয়ং কিনা। স্ব অঙ্গ মানে সর্ব অঙ্গই যে ভগবানের নিত্য প্রকাশিত। যে সঙ্গ করা, হওয়ার জন্য। সেই জন্যই বলা হয় স্ব-অঙ্গ কর, মানে সৎসঙ্গ কর। স্ব অঙ্গ হওয়ার জন্য।

* * *

কেবল নাম কর। জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।

পাঁচ

দিবসের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতি ধীরে উঠে নামে। সীমাহীন মহা-সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতন দিন আসে রাত্রি যায়। অনিবার্য ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধা। সপ্তাহ শেষ হয়, মাস চলে যায়, বছরও ঘুরে আসে। ৬ই জানুয়ারী ১৯৫৪ সন। শ্রীশ্রীমা কলকাতা, পুরীধাম, বিন্ধ্যাচল, কিষণপুর ঘুরে আবার এসেছেন কাশীধামে। শুয়ে শুয়ে আপনমনে গান করেছেন।

ভাবের বন্যায় ভেসে ভেসে প্রাণের ঠাকুর এসেছে রে
এসেছে রে,
(ও মন) প্রাণের ঠাকুর এসেছে রে।
দিবি যদি ভব পাড়ি,
দে না রে তুই নয়ন বারি,
আমার প্রাণের ঠাকুর এসেছে রে।
দীনের বন্ধু এসেছে রে,
দীনের দয়াল এসেছে রে।
দিবি যদি ভব পাড়ি
দে না রে তুই নয়ন বারি।
এসেছে এসেছে····· ···।
দীনের বন্ধু আমার এসেছে এসেছে
কাঙালের ঠাকুর আমার এসেছে এসেছে।
স্বভাব ভাই তার কাঙাল ধরা,
কাঙাল পেলে ছাড়ে না রে।
সে যে ছাড়ে না, ছাড়ে না
ছেড়ে দিতে পারে না, পারে না
জানে না, জানে না।

ঘরের ভিতরের দেয়ালে দেয়ালে সেই সঙ্গীতের অনুরণন জেগে উঠতে থাকে। সঙ্গীততরঙ্গ এদিক-ওদিক চারিদিক ভেসে চলে মৌমাছির ঝাঁকের মতন গুঞ্জন করতে করতে। কি অপরূপ মধুর সে সঙ্গীতের সুরধ্বনি। সুকণ্ঠস্বর ভক্তি আর সুরকুশলতা। অন্তরের স্বতঃস্ফুরিত ছিল যে সে সঙ্গীত! এ যেন সঙ্গীতেরই অধিদেবতা সুরমধুসিঞ্চন করছেন।

এই বিপুল ধরণীর অস্তিত্বের মহাসঙ্গীত আনন্দময়ী মা'র অন্তরে আপনা হতেই যে জাগিয়ে তোলে প্রতিধ্বনি। অনুরণন। তাইতো মায়ের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত হলো দিব্যসঙ্গীত। এত মধুর! এত অপরূপ! এই বিশ্বচরাচরের যা কিছু গতিবান, যা কিছু স্পন্দমান, যা কিছু সচল কম্পমান, প্রদীপেব কম্পমান আলোকের শিখা, দূর নক্ষত্রের জ্যোতির স্পন্দন, পাখীর কূজন, বৃক্ষের পল্লব মর্মর, মানুষের কণ্ঠ, কখনো প্রেমসিক্ত কখনো বা তিক্ত, প্রতিদিনের পরিচিত সব শব্দ, সবই ত সঙ্গীত! এই সবকিছুই মায়ের অন্তরে প্রবেশ করে সঙ্গীতে সুরে ছন্দে রূপান্তরিত হয়ে, একদিন স্বতঃস্ফুরিতভাবে উৎসারিত হতে থাকে। আনন্দময়ী মা যেন নিত্য শব্দায়মান একটি মৌচাক!

* * *

পূর্ণকুম্ভের উৎসব সুরু হয়েছে এলাহাবাদে।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সন। বহু সাধু সন্ন্যাসী যোগী মহাযোগীর মেলা বসে গেছে। দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীরা। আনন্দময়ী মাও এসেছেন। ভক্ত শিষ্যবৃন্দ সমাবৃত হয়ে রয়েছেন। ভারতের নানাস্থান থেকে প্রায় তিন শতাধিক স্ত্রীপুরুষ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে একত্রিত হয়েছেন। বৃন্দাবন থেকে শ্রীশ্রীহরিবাবাও এসেছেন। আনন্দময়ী মা'র ক্যাম্পে প্রতিদিনই আনন্দ-উৎসব চলছে। একদিন দশনামী সম্প্রদায়ের সকল মোহন্তদের নিমন্ত্রণ করে আনা হলো। যথাযোগ্য পূজাদি

করা হলো। ভোজনও হলো। আবার একদিন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকল মোহন্তদের আনা হলো। জ্যোতির্মঠের শ্রীশঙ্করাচার্যও একদিন এলেন। মায়ের সান্নিধ্যে এসে মায়ের সঙ্গে সঙ্গ করে সকলেই খুশি। এইভাবে আনন্দময়ী মাকে ঘিরে মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী আর ভক্তের দল। কুম্ভমেলায়। এলাহাবাদে।

রাত্রে স্নান যোগ। মা বললেন, যার যার ব্যবস্থা করে দল বেঁধে যাবে। প্রত্যেক দলেই যেন ২।১ জন করে পুরুষ থাকে। কিন্তু স্বামীজী বললেন, দুইটি বজরা ভাড়া করা হয়েছে। সকলে একসঙ্গে সেই বজরায় গিয়ে সঙ্গমে স্নান করে আসলে ভাল হয়। মা শুনে সম্মতি দিলেন। মা যে কারো ভাব নষ্ট করেন না। বললেন, বেশ তো, তোমরা যা হয় ব্যবস্থা কর।

৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামী পরমানন্দজী স্বয়ং একশত জনের একটি দল নিয়ে সঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করলন। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে। মাও বার বার করে সকলকে বলে দিলেন, 'তোমরা সকলের মুখে সর্বদাই একটা নাম রেখো।' মা'র মুখ কেমন যেন শুষ্ক। জলভরা চোখ। কণ্ঠস্বর ধীর গম্ভীর। তারপর মা ধীরে ধীরে এসে ক্যাম্পের গেটের কাছে দাঁড়ালেন। তখন জনস্রোত চলেছে। মা দেখে বলে উঠলেন,—দেখ দেখ, জ্ঞান সমুদ্র চলেছে—সকলেই মুক্তির যাত্রী।

মা ফিরে এসে আবার একটু শুলেন। দেখে মনে হয় যেন মন খুবই অশান্ত। মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক ভাব। যেন ভাবী বিপদের ছায়া ফুটে রয়েছে চোখে আর মুখে। গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন, 'কীর্তনে মা'র শরীরটা যেমন এলান থাকে কতকটা সেইরকম।'

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী লোক পাঠিয়ে দিলেন কয়েকজন পুরুষ ভক্তকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারাও মা'কে প্রণাম করে যাত্রা

করলো। মা সকলকেই বলছেন মুখে সর্বদা নাম রাখতে। আবার একটু ঘোরাফেরা করে বেলা নয়টার সময় মা এসে গা এলিয়ে দিলেন বিছানায়। হঠাৎ মা বলে উঠলেন,—এই এই চাপা পড়ল, চাপা পড়ল, চাপা পড়ল—শ্বাস বন্ধ। গুরুপ্রিয়াদেবীও উদাস মা'র কাছে বসেছিলেন। মা'র অদ্ভুত ভীতিজনক কণ্ঠস্বর শুনে উভয়েই চম্‌কে উঠলেন।

গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন, 'আমার ভয় হলো আমাদের ক্যাম্পেরও. এত বিরাট সংখ্যায় স্ত্রীপুরুষ সকলে স্নানে গেছেন, যাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধা ও শিশু রয়েছে। তাদের কিছু হলো না তো ?'

মা আবার বলে উঠলেন, মূর্তি দেখা যায় কি বিকট!

মা'র কথায় গুরুপ্রিয়াদেবী খুবই চিন্তিত হলেন। কারণ মা তো বিপদের সূচনাতেই সবকিছু বুঝতে পারেন।

গুরুপ্রিয়াদেবী এবারে মাকে বললেন, 'তোমার তো বিশ্বময় ভাব। যেখানে যা কিছু হয় তা তোমার কাছে পৌঁছে। আমাদের ক্যাম্পের লোকেদের কিছু হলো নাকি ?' প্রত্যুত্তরে মা বিশেষ কিছু বললেন না। ইতিমধ্যে কেউ কেউ ফিরে এলো। তাদের কাছ থেকে শোনা গেল। স্নানে বিরাট বিশৃঙ্খলার কথা। সাধুদের স্নান দেখবার জন্য উৎসুক জনতার ভিড় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। পরমানন্দ স্বামী যাদের সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলেন, শৃঙ্খলা না থাকায় তারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অনেকে নৌকাও খুঁজে পায়নি। স্বামীজীকে দেখতে পায়নি। এই রকম অবস্থার মধ্যে অনেকে ফিরে এসেছে। অনেকে এখনও আসেনি।

বেলা দশটা নাগাদ শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে যোগীভাই, পান্নালালজী ও গুরুপ্রিয়াদেবী মোটরে রওনা হলেন সঙ্গম অভিমুখে। ইতিমধ্যে স্বামীজী ফিরে এসেছেন। স্বামীজীও বিশৃঙ্খলার কথা স্বীকার করলেন। দ্বিতীয় দলের সাথে স্বামীজীর দেখাই হয়নি। গঙ্গাদিও ফেরেননি। কয়েকজন মেয়েদের নিয়ে গেছেন। সাধুদের দর্শনের

আশায় আছেন। এবার মাও মৃদু অভিযোগের সুরে স্বামীজীকে বলছেন, এটা কি ঠিক হয়েছে, তাদের ফেলে আসা? তোমার ব্যবস্থামতই তো দুই দলে এত মেয়ে পুরুষ পাঠানো হয়েছে। তুমি আবার যাও। সকলের খোঁজ কর।

নির্বিকার পরমানন্দ স্বামী আবার গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন। মাও এসে পৌঁছলেন। দূর হতে মাকে দেখতে পেয়ে অনেকেই এসে মিলিত হলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী মায়ের জন্য বজরা আনতে গেলেন। স্বামীজীর বজরা আনতে দেরী দেখে, একটা ছোট বজরা নিয়েই মা সঙ্গমে চললেন। তারপর গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ভক্তদের গায় মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। কেউ আবার স্নান করেও উঠলেন। মা একটু অন্যমনস্ক এবং আচ্ছন্নভাব। এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াগুলি অতি দ্রুত যেন সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছেন।

আর অতি সাধারণভাবে মা এবার কুম্ভস্নানের লীলা সমাপন করে চলেছেন। পথে পান্নালালজী জিজ্ঞেস করলেন—মা, আপনার কার সঙ্গে বিদ্বেষ? যেমন দেখা যায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষভাব।

—বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষ। মা বললেন। আবার বললেন, ইহাও ঠিক। আবার বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষ নাই ইহাও ঠিক।

যত কথাই হোক না কেন মা'র ভাবটা কিন্তু খুব আনন্দপূর্ণ নয় বলেই অনেকের মনে হচ্ছে। কোথায় যেন কি একটা হতে চলেছে। এবং সেটা মোটেই শুভ নয় এমনই যেন মায়ের মনের অবস্থা। তাই তো দেখা গেল ক্যাম্পে ফিরেই মা আবার জিজ্ঞেস করলেন,—কোন খবর এসেছে নাকি?

তখনও মা'র কথার রহস্য, প্রকৃত অর্থ কেউই ধরতে পারলেন না। কিছু সময় পরেই সেই বিরাট দুর্ঘটনার সংবাদ এসে গেল। মা বলে উঠলেন,—'এতক্ষণ দেখছিলাম পরিষ্কার স্তূপাকার মৃতদেহ। আর শুনছিলাম মরণোন্মুখ মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণার আর্তনাদ। এবারে ভক্তদের দৃষ্টির সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে গেল এত সময় ধরে

মায়ের ভাবান্তরের কারণ। যে দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে তারই পূর্বাভাস পেয়ে মায়ের মনে যে বেদনা অনুরণিত হচ্ছিল তাই ফুটে উঠেছিল মায়ের চোখে আর মুখে। এখানে যে মায়ের করণীয় কিছুই ছিল না। অমৃত কুম্ভমেলার মাটি আর ধূলি হতে এক শোকরাগিণী গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। শত শত মানুষের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হলো তীর্থভূমির মাটিতে। কুম্ভমেলার দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে মা বলছেন, 'যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদেরও দেখা গেল। আর যারা চোখ বুজলো তাদেরও দেখলাম। যেখানে ঘটনাটি ঘটল এমন হলো যেন এই শরীরই চাপা পড়েছে এবং এই শরীরেই যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।'

ভক্তরা প্রশ্ন করলেন, এই যে এত লোকের অপমৃত্যু হল, এদের কি গতি হল ?

—শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই কথা। বিশেষ যেখানে সেখানকার কথা আলাদা। ধারণা হয় বিচারে। কারণ যা, তার একটা আভাস তো দিবেই। আর এখানে দেখো কুম্ভ যোগ। ত্রিবেণী ক্ষেত্র। সাধুদের বায়ুমণ্ডল। মহাত্মাদেব সব একমুখী গতি। এই সময়ে এই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু কি না, তাই একটা বিশেষ গতির দিক তো বটেই।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি কি তাদের কষ্টভোগ নিয়ে নিলে ?

এখানে ত ভোগের ভাগ না। কষ্টেব ভাগ না। সম। আবার এটাও না হয়ে পারত। খেলা আর কি! ভোগ নেওয়া মানে ভাগ নেওয়া। যেখানে নেওয়া দেওয়ার কথা। জগতের মত শ্বাস বন্ধেব দিক এটা না। তোমাদের কথায় যেমন কথা বলা হয় যে কোন অবস্থায় থেকেও। শ্বাস বন্ধ রূপেই বা কে ? কষ্ট রূপেই বা কে ? আর তাদের ভোগ নিয়ে নেওয়া এটা অন্য কথা। সব ক্রিয়াটা সব তাতে সম্ভব নয়তো। কিন্তু সবটাই যে তৎ।

এখানে হাসি যা, খেলাও তাই। আর শ্বাস বন্ধটাও সেই ভং। সেই দিকের ক্রিয়া আর কি। এই প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গেও শ্রীশ্রীমা'র অনেক কথা হলো।

তারপর কুম্ভমেলার সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা ও বিষণ্ণ পরিবেশ থেকে শোকদুঃখতাপিতা মন নিয়ে মা ফিরে চললেন। যাত্রা করলেন বিন্ধ্যাচলের পথে। বিন্ধ্যাচলে তিন দিন বাস করে আবার চলে এলেন কাশীধামে। গীতা জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে।

শ্রীযুত গোপাল ঠাকুর এলাহাবাদ থেকে দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন কাশীর আশ্রমে। সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করলেন গীতা জয়ন্তী উৎসব। গোপাল ঠাকুর বললেন, 'মা'র কৃপাতেই এসব সম্ভব হলো।'

ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মা বলছেন, 'ভগবানের নামে ফল হইবেই। এই যে মন লাগে না বল এও ত কৃপা। মন না লাগিলেও ওষুধ খাইবার মত খাও। ফল তাহাতে ভালই হইবে। ওষুধ খাইলে রোগ সারিয়া যায়। সংসারী বিষয়ে যেমন কখনও সারে কখনও সারে না, ভগবানের বিষয়ে তা নয়। সারিবেই। তাই বলা হয়, এক ত হাসপাতালে ভর্তি হইয়া যাও। ডাক্তারের ওষুধ খাও। নিয়মিত পথ্য খাও। রোগ আরোগ্য হইবে। অথবা ডাক্তারের ওষুধ আনিয়া বাসায় বসিয়া খাও। সঙ্গে সঙ্গে পথ্যাদিও নিয়মিত কর। অর্থাৎ হয় সব ছাড়িয়া তাঁহার নাম নিয়া পড়িয়া থাক, অথবা সংসারে থাকিয়াই গুরুর উপদেশ মত নাম নেও, নিয়মিতভাবে থাক। তাহাতেও রোগ আরোগ্য হওয়ার আশা। ছোটকালে পড়িতে কি ভাল লাগে? কিন্তু পিতামাতা ও মাস্টারের সামনে নিয়মিত পড়িয়া সে ত বিদ্বান হইয়া যায়। এটা যেমন অর্থকরী বিদ্যা। আবার ঐদিকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলে পরম ধনের আশা। পরম ধন কি? না, ভগবান স্বয়ং। ভগবানকে

ভালবাসিতে পারিলে আর দুঃখ নাই। তার জন্য যে বিরহ তাহাও সুখই। তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলে ত তবে তাঁহার জন্য বিরহ হইবে। বিরহ মানে কি ? না, বি-রহ, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে থাক। মানে ভগবান যাঁহার মধ্যে বিশেষভাবে রহেন তাঁহারই বিরহ হইতে পারে।'

* * *

যাহা ভগবানকে ভুলাইয়া দেয় তাহাই মোহ। এইজন্যই বলা হয় যে সংসারে যাহাদের নিয়া থাকিতে হইবে তাহাদের মধ্যেও ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা কর। মনে করিতে হয় যে তিনিই এইরূপে আমার কাছে আছেন। এইরূপ করিলে আর বন্ধনের কারণ হয় না।

মোহটাকে মহান ভাবের মধ্যে নিয়া যাওয়া। তাঁহার দিকই দিক। অন্য কোনও দিকেই আর শান্তি নাই।

সপ্তাহ শেষ হয়, মাস চলে যায়, আবার আসে নূতন সপ্তাহ। নূতন দিন। কাশীর আশ্রম আবার মেতে ওঠে শিবরাত্রির আনন্দ উৎসবে। আনন্দময়ী আশ্রমে শিবরাত্রির উৎসব এক বৃহৎ ব্যাপার। মহামহোৎসবের আনন্দে, ভক্তকণ্ঠের হরিনামগানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো শিবালয়ের প্রাঙ্গণ। শিবপূজার সব ভার মা'ই নিয়েছেন। পূজার বাসন, নৈবেদ্য, পুষ্প চন্দন, ফলমূল সব মা'ই ঠিক করিয়ে রাখছেন। পূজার মধ্যে ছেলে মেয়েরা মিলিত কণ্ঠে স্তব পাঠ সুরু করে দিল। সেই অপূর্ব ছন্দময় স্তব পাঠের ধ্বনি আনন্দময়ী আশ্রমের বক্ষ হতে উত্থিত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। উৎসব জেগে উঠলো শত শত দীপের আলোকে, সুধাস্রাবিত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে, ধূপের সৌরভে আর পুষ্পসজ্জার সমারোহে। মাল্যে চন্দনে সুন্দর হয়ে তৃপ্ত হয়ে আর শান্ত হয়ে যেন বসে আছেন শিব। এক অনির্বচনীয় পরিবেশের হয়েছে

সৃষ্টি। শত শত ভক্ত মানুষের মেলায় আনন্দময়ী আশ্রম সকাল সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠলো।

আবার একদিন এই আনন্দোৎসবেরও হলো অবসান। মা আনন্দময়ী কাশীর আশ্রমের আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে আবার যাত্রা করলেন বৃন্দাবনধাম অভিমুখে। হোলি উৎসব উপলক্ষে। শ্রীশ্রীহরিবাবার আমন্ত্রণে। বৃন্দাবনে এখন মা আনন্দময়ীর নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মা অবশ্য প্রথমে হরিবাবার আশ্রমেই উঠলেন। তারপর সকলে মিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্তিসহ কীর্তন করতে করতে নূতন আশ্রমে চলে এলেন। ঠাকুরদ্বয়কে আসনে বসিয়ে মালা চন্দন দিয়ে আরতি করলেন গুরুপ্রিয়াদেবী। স্বামী অখণ্ডানন্দজী, শরণানন্দজী, শ্রীশ্রীহরিবাবা ও আরও অন্যান্য মহাত্মারা রয়েছেন। ওঁদের মধ্যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী যেন অনির্বচনীয় প্রসন্নতার প্রতিমূর্তিরূপে রয়েছেন বিরাজিত। যেন সর্বপ্রসারী আনন্দসাগরের উদ্বেল বন্যা। অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র যেন।

দীর্ঘ, জটিল উপলবন্ধুর পথ হেঁটে হেঁটে মা সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করছেন। কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। আবার যাত্রা হলো সুরু। হোসিয়ারপুরের পথে। পাঞ্জাবে। শ্রীশ্রীহরিবাবার আশ্রমে। জয় মা জয় মা কীর্তন করে পাঞ্জাবের অধিবাসী মহাত্মা শ্রীশ্রীহরিবাবা, শিষ্য ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে অভ্যর্থনা করলেন। হরিবাবা স্বয়ং মা'র দিকে মুখ করে পিছন দিকে চলছেন আর মায়ের চলার রাস্তার উপরে নূতন কাপড় বিছিয়ে দিচ্ছেন। অগণিত শিষ্য ভক্তরা মাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একত্রিত হয়েছেন। সে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় পরিবেশের হয়েছে সৃষ্টি। মা'র মুখের একটু কথা শুনবার জন্য, মা'র সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলবার জন্য

সকলেই উদ্‌গ্রীব। পাঞ্জাবের অধিবাসীরাও আনন্দময়ী মাতাজী নামে বিভোর।

নিয়মিতভাবে সৎসঙ্গ চলছে। কত কথা, কত আলোচনা। মা বলছেন,—'সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন করতে থাক। তবেই যাহা ছাড়বার তাহা ছেড়েই যাবে। আর যা কখনও ছাড়ে না ছাড়া যায় না, তা থেকেই যাবে। এই কথা বলা হইতেছে না সব ছাড়িয়া চলিয়া যাও। সব নিয়াই থাক। সেবা বুদ্ধিতে সংসার কর। কোনও ভয় নাই। তাঁর ইচ্ছা হইলে তিনিই তোমাকে শুদ্ধ করিয়া তাঁর নিকট লইয়া যাইবেন।' আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের লক্ষ্য করে বলছেন, 'দেখ, বৃদ্ধ শরীর বলিয়া মনে করিও না যে আর কি হইবে? যদি সময় হয়, তাঁর কৃপা হয়, এই সময়টুকুর মধ্যেও ত হইয়া যাইতে পারে।

'দেখ, দেহ সংযম, বাক্ সংযম ত অনেক সময় হয়। কিন্তু মন সংযমের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। সারাটা দিন মনটা কি করে ধরতে পার াক? সর্বদাই মনটাকে নিজের বশে রাখা। গভীর অন্ধকারে মনের মত গুহায় প্রবেশ করে সেখানে ক্রিয়া করে আসনে বসে পড়া। যতক্ষণ পারা যায় জপ-ধ্যান ইত্যাদিতে থাকা। অবশ্য গুরুকৃপাই সব, ইহা কিন্তু মনে রেখো।

'জগৎ মানে কি? যা গতি। অন্তর্জগতের ক্রিয়া মানে অন্তর্যামী যিনি তাঁর জন্য যত ক্রিয়া অন্তরালে হয়। সেগুলিরও আবার অনেক স্তর আছে। সেই স্তরের মধ্যেও গভীর হতে গভীর-ক্রিয়া অর্থাৎ যে গতিতে অন্তর্যামী প্রকাশ। আর যে প্রকাশে অন্তর বাহির এক। বহির্জগতে বহির্মুখী যে ক্রিয়া। প্রাণ ত একটাই। প্রাণবায়ুও একটাই। অন্তরক্রিয়াতে সব কথাই সম্ভব। তাহলে অন্তর্জগতে যেখানে অনন্ত ক্রিয়া সেখানে তুমিই যে স্বয়ং নানারূপে নানাভাবে নানা আকারে প্রকাশিত আছ। তোমার

'জিজ্ঞাসা তোমাকেই পাওয়ার জন্য। অন্তর আর বাহির একমাত্রই যে। সেই প্রকাশের জন্য স্থূল ক্রিয়া যেমন আছে অন্তরক্রিয়াও তেমনই আছে। অন্তরে আছে, স্থূলে প্রকাশ হয়। আবার স্থূলে আছে, অন্তরে প্রকাশ হয়। সেইটাই স্থূল সূক্ষ্মে ও কারণে, অন্তে আর অনন্তে, এক হইয়া মহাকারণে—যখন মহাপ্রকাশ তখন।'

মা আবার বলছেন, 'দেখ, হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। হরি মানে যিনি দুঃখ হরণ করেন। অর্থাৎ যাহা অমৃতবাণ। অমৃতবাণ মানে অমর বাণ। যাহা অমৃতের পথে নিয়া যায়। সেই হরি কথাই কথা ; আর সব বৃথা ব্যথা। যাঁহা রাম উঁহা আরাম, যাঁহা নহী রাম উঁহাহী বে-আরাম। ব্যারাম। এই শরীরের ত এই-ই কথা।'

* * *

—আচ্ছা মা, ভগবানকে কি করে পাওয়া যায়? জিজ্ঞেস করলেন একজন ভক্ত।

—তাঁর জন্য কাঁদলেই তাঁকে পাওয়া যায়। বললেন শ্রীশ্রীমা।

—আমার ত কান্নাই আসে না।

—যাঁরা কাঁদে তাদের সঙ্গ কর। হেসে হেসে মা বললেন।

—আচ্ছা ভগবানকে পাবার জন্য কতটা নিজের চেষ্টা দরকার আর কতটা তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে?

—তাঁর উপর যে নির্ভর করা এও ত তিনিই করাবেন। তবেই ত তুমি করতে পারবে।

—আচ্ছা মা, এসব অনিত্য বস্তুতে আমাদের আকর্ষণ কেন? নিত্য বস্তুতে কেন আকর্ষণ হয় না?

—এই সব যে তাঁরই লীলা। তিনি নিজেই নিজেকে নিয়া খেলা করছেন। চণ্ডীতে আছে না,—'ভ্রান্তিরূপেণ-সংস্থিতা'। ভ্রান্তিরূপেও যে তিনিই। তবে কি হয়? বিষয়ে আসক্তি হলে

নীচে নেমে যায়। আর তাঁর দিকে আকর্ষণ হলে আনন্দ ও মুক্তি। বিষয়ে আসক্ত হলে 'রিটার্ন টিকিট', মানে আসা যাওয়া। সবই যে অনন্ত। অন্-অন্ত অর্থাৎ যার অন্ত নাই। তাই সর্বদা বলা হয় তোমরা তাঁর নাম ছাড়িও না। চুপে চুপে করিও। কাউকে দেখাইতে বা শুনাইতে নাই। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে বৃথা নষ্ট করতে আছে কি? যেমন শ্বাস চলছে তেমন নামও চালাতে চেষ্টা করা। শরীরের ত প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথমে ছোট ছিলে, এখন বড় হয়েছো। এই যে গতি, একেও শুভ ও মঙ্গলজনক করা চাই। নতুবা আত্মহত্যা করা হয়। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন তাঁর উপরই সব ছেড়ে দাও। নাম, নামেই সব হয়। হরি হরি বল, দুটি বাহু তোল, চল চল চল, দয়াল মাঝির নায়।

ছয়

শিব শম্ভু দয়াল হর দয়াল হর
দয়াল হর দয়াল হর।
তোমার অফুরন্ত করুণা ধারা করুণা ধারা
করুণা ধারা করুণা ধারা।
আমায় ডাক ডাক ডাক ডাক
শিব শম্ভু দয়াল হর······।

নিজের মনে গুনগুন করে গান করছেন। আলমোড়া আশ্রমে। কিছুক্ষণ পর আবার হেসে হেসে বললেন গুরুপ্রিয়া-দেবীকে, 'দেখছি দলবল সব গাইছে।' অর্থাৎ মা সূক্ষ্মে এই সব দেখছেন। মা এখন ভাবানন্দে বিভোর। আত্মস্বরূপে অবগাহন করছেন।

৺ভাইজীর সমাধির উপর শিব স্থাপন উৎসব উপলক্ষেই শ্রীশ্রীমা এসেছেন আলমোড়ায়। ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৪ সন। এই শিবলিঙ্গ নর্মদার তীর থেকে নিয়ে এসেছেন ভাইজীর বিশেষ প্রিয় ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত। শিবজী এতদিন ছিলেন কাশীধামে। সেখান থেকে নিয়ে এলেন ব্রহ্মচারী পান্নু। সেও এক অলৌকিক কাহিনী। শ্রীশ্রীমা'র নির্দেশে পান্নু ব্রহ্মচারী যখন শিবলিঙ্গ নিয়ে আলমোড়ার পথে রওনা হয়েছেন তখন থেকেই নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। রাণীক্ষেতের কাছে পথে হঠাৎ বাস উল্টিয়ে গেল। একটি পুলের সাথে ধাক্কা লেগে নীচে পড়তে লাগলো। অনেক নীচে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারা। সেখানে পৌঁছুলে যাত্রীদের কারোরই প্রাণরক্ষার আশা থাকে না। কিন্তু বাসটি অলৌকিক-ভাবে একটি বড় বটগাছের গায়ে আটকে রইলো। তার

ফলে যাত্রীরা সামান্য আঘাত পেয়েও প্রাণে বেঁচে গেল। আর শিবলিঙ্গের রক্ষক পান্নু ব্রহ্মচারী বিন্দুমাত্রও আহত হলেন না। অপরদিকে তাঁরই সর্বাপেক্ষা গুরুতর আঘাত পাওয়ার কথা। কারণ ড্রাইভারের পিছনেই ছিল তাঁর সিট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পান্নু ব্রহ্মচারীই শিবলিঙ্গের রক্ষক, না শিবলিঙ্গই ব্রহ্মচারী পান্নুর জীবন রক্ষা করলেন? শিবজীর বাহক, রক্ষককেই শিবজী রক্ষা করলেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় গাড়ি উল্টিয়ে গেলে সব জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু শিবলিঙ্গটি যে বাক্সে প্যাক করা হয়েছিল তার কোনরূপ ক্ষতিই হয়নি। এবং স্বয়ং শিবলিঙ্গটিও ছিল অক্ষত।

শ্রীশ্রীমা সবকিছু শুনে বললেন, 'শিবজী ত আসার সময় হতেই তাঁর প্রভাব দেখাচ্ছেন। শিবজীর কৃপায় তাই পান্নু ও অন্যান্য সকল যাত্রীই এইভাবে রক্ষা পেল।

শিবজীকে প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন রাত্রিতে বৃন্দাবনের ভক্তপ্রবর যোগেনবাবু, স্বপ্নে বহু সাধু সন্ন্যাসী এবং ভাইজীকেও দর্শন করলেন।

আলমোড়ার আনন্দময়ী আশ্রমের বিশেষত্ব হলো, এই আশ্রমটি সাধুদের সমাধিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত আর এই জন্যই ভাইজীর সমাধি এইখানে দেওয়া স্থির হয়েছিল।

অবশেষে মহাধুমধামে শিবজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। উৎসব জেগে উঠলো শত শত দীপের আলোকে, মৃদঙ্গের সুধাস্রাবিত ধ্বনিতে, ধূপের সৌরভে, আর নানা পুষ্পের সমারোহে। যোগেশ ব্রহ্মচারীর হাত দিয়েই শিবজী প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন ভক্ত যোগেন। মায়ের স্নেহধন্য যোগেনবাবা।

নব প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও নানারকম সুগন্ধি জল দিয়ে স্নান করান হলো। পূজার ভার পড়লো বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীস্বরূপের উপর। শিবজী ও সমাধিস্থানটি ফুল-মালায় সুশোভিত হয়ে উঠলো।

মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো আলমোড়ার আনন্দময়ী আশ্রম। প্রায় পাঁচশত স্ত্রীপুরুষ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

মাকে ঘিরে আনন্দের হাট বসে গিয়েছে আলমোড়া আশ্রমে। বহু ভক্ত সমাগম হচ্ছে। শহর থেকে রোজই কেউ না কেউ আসছেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। শুধু দেখা নয়, প্রণাম করবে, কথাও বলবে। বিদেশীয় ইউরোপ আমেরিকার মানুষও আসছেন। নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে। একজন প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন ?

—বাঃ, সর্বদাই তো দেখা হচ্ছে। আবার দেখ, কে কাকে দেখবে ? সবই যে তিনি। ভগবান ছাড়া যে আর কিছুই নেই। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ঘরে বাইরে সর্বত্রই তো তিনি রয়েছেন। অন্তরের টান হলে তিনি এসে ধরা দেন। হাসি হাসি মুখে বললেন শ্রীশ্রীমা।

আবার বলছেন অন্য এক প্রসঙ্গে, সত্ত্ব রজঃ তম এই ক্রিয়ার যে মূল তরঙ্গ রূপে সেই হইল প্রাণ। আবার দেখ, এক জীব হইতেই বহু জীব। এই হইল জীব ধারা। এক ঈশ্বরই বিভক্ত হয়েছেন সব জীব রূপে। তাই তো বলা হয়ে থাকে, 'যত্র জীব তত্র শিব।'

* * *

আবার একদিন পূর্ব আকাশে সূর্য দেখা দেবার প্রাক্ মুহূর্তে, উষাভাসের ঈষৎ আলোকে এসে আনন্দময়ী মা দাঁড়ালেন ভাইজীর সমাধির নিকট শিবজীর মন্দিরের সম্মুখে। তাঁর চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলো একটি ব্যথিত মূর্তি, দেহলীলা সম্বরণের পূর্ব মুহূর্তেও যে মূর্তি মাতৃনামে ছিল বিভোর। জীবনের শেষ মুহূর্তের সেই করুণ দুই চোখের চাহনি আর মা—মা ডাকের করুণ শব্দ আজও যেন অকস্মাৎ মায়ের মনকে করে তুললো বিচলিত। তখন এক করুণ রাগিণী তাঁর অন্তর হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হতে লাগলো। আর কানে ভেসে আসতে লাগল যেন ভাইজীর রচিত সঙ্গীত ভাইজীরই কণ্ঠ হতে গীত।—

বল আর কতদিন আকুল পরাণে কাঁদিতে হইবে জননি ?
কবে হৃদয় যন্ত্রে, তন্ত্রে তন্ত্রে বাজিবে তোমার রাগিণী ?
কবে সফল দুঃখের, সুখের ভিতর, প্রেমরসপানে হইব বিভোর ?
নয়ন খুলিতে, শ্রবণ ফিরাতে শুনিব তোমার বাণী ?
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা, বুঝি ডুবে যায় এই
দেহ ভেলা,
কে আছে আমার তুমি বিনে আর হৃদয়ের ধন পরশমণি।

ভাইজী আজ আর ইহধামে নেই। কিন্তু তাঁর সমাধি মন্দির যে আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁর স্মৃতি। সে সমাধি বাইরে নয়, মায়ের মনোভূমিতেই যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। বিস্মৃতির মধ্যেই সুপ্ত হয়ে রয়েছে ভাইজীর বিদায় দিনের বিষাদপূর্ণ স্মৃতিটুকু।

এই পৃথিবী, এই বিশ্বচরাচর এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। বেদনাটুকু ক্ষণিক কিন্তু বেদনাটুকুই সত্য। এক একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে বেদনাটা কী ভয়ঙ্কর সত্য। ...কি বিপুল বেদনা! কিন্তু হিমালয়ের তাতে কিছু যায় আসে না। মা আনন্দময়ীও হিমালয়ের মতই অচঞ্চল, শক্তিমান। আসুক বেদনার ঝড়...যত প্রবলই হোক, সহ্য করবার ক্ষমতা আছে তাঁর। দুঃখের চেয়ে বড় সেই বেদনাকে সহ্য করবার শক্তি,...কি আনন্দ আছে সেই শক্তিতে! যে শক্তিমান্, আনন্দে সে পারে বেদনাকে গ্রহণ করতে। বরণ করতে। ভাইজীর মৃত্যুর বেদনাকেও মা এমনিভাবে একদিন সহ্য করে নিয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে প্রভাতসূর্যের আলোকে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অরণ্য, শিবজীর মন্দির, আলমোড়ার আশ্রম সবকিছু। মাও ধীরে ধীরে ফিরে চললেন ঘরের দিকে। আত্মসমাহিত অবস্থা। ভক্তরাও একে একে এসে উপস্থিত হলেন মাকে প্রণাম করবে বলে। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মায়ের মুখে চোখে আবার ফুটে উঠলো স্নিগ্ধ হাসির ছটা। সহসা বিষণ্ণ মন হয়ে উঠলো প্রসন্নময়ী।

বাতাসও মধুরতায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। কোথায় তলিয়ে যায় তাঁর দুঃখের ভার। ফুলের মতন হেসে ওঠে অন্তর। মুক্তির শ্বাস ফেলে নিঃশব্দে তিনি আবার প্রবেশ করেন তাঁর ভাবজগতে। গুনগুন করে গান করতে লাগলেন, দুই হাতে মৃদু করতালি দিয়ে···গোপাল, গোপাল, ব্রজের রাখাল, নন্দদুলাল প্রেমগোপাল।

আবার একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো। ২রা মে। সুরু হলো মায়ের জন্মোৎসব। আলমোড়াতেই।

আলমোড়ার আশ্রম আবার মেতে উঠলো, নেচে উঠলো মহা-মহোৎসবের আনন্দে। দূর দূরান্ত হতে ভক্তবৃন্দরা এসে মিলিত হতে লাগলো। মহামহিমময় হিমালয়ের পদতলের আলমোড়া আশ্রমে। এলেন শ্রীশ্রীহরিবাবা, কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী। ব্রহ্মচারী কান্তিভাই এঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। আরও এসেছেন বিশিষ্ট মহাত্মারা। সাধু সন্ন্যাসীরা।

স্থানীয় ভক্ত হরিরাম যোশীই সকল কাজে অগ্রণী হয়ে জন্মোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে চেষ্টা করছেন। কারণ অনেকদিন থেকেই তিনি চেষ্টা করছিলেন যাতে মা'র জন্মোৎসব আলমোড়াতে প্রতিপালিত হয়। আজ মা তাঁর ইচ্ছাকে, আকাঙ্ক্ষাকে যে পূর্ণ করলেন! অখণ্ড নাম কীর্তন সুরু হয়েছে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥···আবার বল হরিনাম আবার বল। মধুর এই হরেকৃষ্ণ নাম আবার বল।' কীর্তনে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হলো। বেজে উঠলো মৃদঙ্গ খোল করতাল। ভক্তমণ্ডলী অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমায় নেচে নেচে কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগলেন। অশ্রুকম্পপুলকে বিভাবিত হয়ে পড়েছেন সকলে। বালক বৃদ্ধ নারী সকলেই যে নাম সংকীর্তনে বিভোর! মা যে বলেন, নাম কর নাম কর, নামেই সব হয়। সেই নামধ্বনিতেই আলমোড়ার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে 'হরি হরি বোল' উচ্চধ্বনিতে ভক্তবৃন্দের

দেহ মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগলো। কীর্তনে এই উচ্চধ্বনি প্রসঙ্গেই একদিন ভক্তপ্রাণ অবনীদা জিজ্ঞেস করেছিলেন আনন্দময়ী মাকে, আচ্ছা মা, লোকে যে কীর্তন করতে করতে জোরে ধ্বনি দেয় তার অর্থ কি ?

প্রত্যুত্তরে মা বললেন,—অর্থ হলো বাইরের ভাবগুলিকে সরিয়ে মনটা কীর্তনের মুখে লওয়া আর কি।

আবার একদিন বললেন, মিশ্রি মুখে রাখ। মিশ্রি মুখে রাখলে তার এমন গুণ যে মুখে জল আপনি বের হবেই, অর্থাৎ নাম নিতে নিতে নামে রুচি হবেই। অবশ্য গুরুকৃপাতেই সব হয় এটা কিন্তু সর্বদা মনে রেখো।

মা ভক্তমণ্ডলীকে বলছেন, যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে পেতে চেষ্টা কর। তাঁকেই ডাক। তোমাদের কষ্টের কথা আবেদন নিবেদন যা কিছু প্রাণ খুলে তাঁকেই জানাও। তিনি পূর্ণ কিনা, সবদিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে সর্বদুঃখহারী। সর্বদাই তাঁকে ডাকতে চেষ্টা কর। তাঁরই ধ্যান কর। তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর। তিনি যে মঙ্গলময় শান্তিময় আনন্দময়। প্রাণের প্রাণ। আত্মা।

ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মমুহূর্তটি এগিয়ে এলো। রাত্রি শেষ প্রহর। তিনটার সময় শ্রীশ্রীমায়ের পূজা আরম্ভ হলো। পূজা করলেন অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত অগ্নিসত্ত্বা শাস্ত্রী, মন্ত্রাচার্য বাটুদা। সমস্ত পরিবেশটি তখন আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহমণ্ডিত হয়ে উঠলো। আনন্দময়ী মা'র অন্তরস্থিত মন্ত্রময়ী তেজোময়ী অমোঘ বাঙ্ময়ী শক্তির প্রভাব আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে মিলে মিশে একাকার হয়ে ভক্তদের মনকেও বিভাবিত করে তুললো। যেন প্রাণময় চিন্ময় বেদময় আত্মময় হয়ে উঠলো তারা। কি প্রাচুর্য, কি শক্তি, কি আনন্দ! যেন নিজের মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণ। জীবন যেন কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিণী! অনন্ত আশার

অনাদিভাণ্ডার। একটা হাসি, একটা গান, বিরামবিহীন একটা মাদকতা যেন। ভেসে চলেছে অনন্তের বুকে। কি আনন্দ! আনন্দ···আনন্দ···আনন্দ···ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার···। তাদের সত্তার মধ্যে এমন কিছু নাই যা আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে। সব শক্তি সব অনুরাগ দিয়ে তারা যে আনন্দকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাদের মা যে আনন্দময়ী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা!

* * *

—'এস, এস। কারা কারা এইভাবে মন্ত্র নিতে চাও।' মা বলছেন। ভক্তদের। বেরেলীতে। জুন মাস। অসহনীয় গরম। কিন্তু ভক্তদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সৎসঙ্গ চলছে। সৎসঙ্গের জন্য বিশাল প্যাণ্ডেল হয়েছে। সেইখানেই এক ভদ্রমহিলা মন্ত্র নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোন্ নাম ভাল লাগে? মা'র কথার উত্তর দিতে গিয়ে অকস্মাৎ তিনি একটি বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে ফেললেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন,—যে মন্ত্র তোমার মুখ হতে এখনই বের হলো তাই জপ করবে।

পান্নালালজীও উপস্থিত রয়েছেন। তিনি সব ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। অভিভূত ভদ্রমহিলাটিকে বললেন, ব্যাস্, হয়ে গেছে। মা'র থেকেই মন্ত্র পেয়ে গেলেন। মা-ই আপনার গুরু। মাকে প্রণাম করুন। মহিলাটি মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। কাছে আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন। তাঁরাও মন্ত্রপ্রার্থী হলেন। মা তখন ভাবানন্দে বিভোর। ভাবাবস্থায়ই সকলকে মন্ত্র নেবার জন্য আহ্বান করলেন। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী পানু ব্রহ্মচারী (পানুদা) বলছেন,—'সে সময় মা'র মুখের ভাবটি একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। মা'র এই ভাবের মধ্যে যার যে নাম ভাল লাগে সে তাই এসে মা'র কাছে বলতে লাগলো। এবং মাও তাই জপ করতে বললেন। মা'র নিকট হতে আদেশ পেয়ে তাদের স্থির বিশ্বাস

হলো যে তাদের দীক্ষা ঐভাবেই হয়ে গেল। এবং মা'ই তাদের গুরু।'

মন্ত্র দীক্ষা নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রার্থনা জানালে সাধারণতঃ মা বলেন, 'এই শরীর ত দীক্ষা দেয় না। যেখানে তোমাদের প্রাণ চায় সেইখান থেকেই দীক্ষা নেও।' আবার কোন কোন সময় মা বলেন, 'তোমাদের কি নাম ভাল লাগে? ভিতর থেকে কি নাম আসে? যে নাম ভাল লাগে, যে নাম আসে, সেই নামই জপ করবে।' মা ভিতরের সংস্কার অনুসারে সেইরূপ ধারা ধরিয়ে বুঝিয়ে দেন।

আকার-নিরাকারের ভিতর কোনটি গ্রহণ করা উচিত?

প্রত্যুত্তরে মা বলেন, দেখ, কোন্ ভাবটি তোমার ভিতর প্রবল? যে ভাব প্রবল, সেই ভাব অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করবে। মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সময় কেউ কেউ বলেন,—মা. সব নামই আমার ভাল লাগে। তখন মা বলেন,—'দেখ, ঘর থেকে বের হয়ে প্রথমে এক রাস্তায় চলতে হয়, তবেই রাস্তা সকল জানা হয়।' আবার অনেক সময় মা একটা সময় দিয়ে দেন, সেই সময়ের মধ্যে প্রাণের ঠাকুররূপে যিনি প্রকাশিত হন, তাঁকেই লক্ষ্যরূপে ধরতে বলেন। তাঁরই নাম জপ করতে বলেন।

শাস্ত্রীয় বীজমন্ত্রাদি প্রাপ্তির ব্যাপার নিয়ে বহু ঘটনা ঘটেছে আনন্দময়ী মাকে কেন্দ্র করে। অনেক ভক্ত স্বপ্নে বা ধ্যানে বসেও বীজমন্ত্র লাভ করেছেন আনন্দময়ী মা'র নিকট থেকে।

লীলাময়ী মায়ের লীলারও নেই শেষ। কখনও হয়ত কাউকে স্পর্শ প্রদান করে ভগবৎ অভিমুখে যাওয়ার সহায়তা দান করছেন। আবার কখনও অন্য কারণে কিছু করছেন। কখনও আবার শত অনুরোধ করলেও কিছু করা আসছে না। মা বলেন, 'তাঁরই সব। তিনিই ত স্বয়ং সর্বরূপে। যখন যেরূপে নিজেকে নিয়ে নিজেই খেলেন।'

শ্রীশ্রীমা আবার হঠাৎ চলে এলেন চুনারে। ডাক্তার পান্নালালজীর বিশেষ আগ্রহে। পাহাড়ের গায় একটি বিশেষ স্থানে পঞ্চবটি স্থাপন করবার উৎসব উপলক্ষে। সেই বিশেষ স্থানটুকুর একটা ইতিহাস আছে। মা যখন ভাইজীর সঙ্গে চুনারে ছিলেন সেই সময় একটি অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে ঐ স্থানটি।

পাহাড়ের পথে চলেছেন শ্রীশ্রীমা ও ভাইজী। হঠাৎ উভয়েরই লক্ষ্য পড়লো পথের মাঝে পড়ে থাকা একটি জবাফুলের মালার প্রতি। বিস্মিত হলেন ভাইজী। আর স্মিত হয়ে ওঠে শ্রীশ্রীমার দুই ওষ্ঠ। অনেক অনুসন্ধান করেও নিকটে কোনও জবাফুলের গাছ দেখা গেল না। প্রশ্ন হলো ভাইজীর মনে,—এ কি করে সম্ভব? এ মালা এলো কোথা থেকে আর কেনই বা? ভাইজীর যুক্তিবাদী মনের প্রশ্ন। মা মৃদু হেসে বললেন,—শাহবাগে চিঠি দিয়ে জানতে। কালীমূর্তির গলায় আজ জবাফুলের মালা ঠিকমত দেওয়া হয়েছে কিনা। আরও নির্দেশ দিলেন ভাইজীকে মালার ছড়াটিকে সযত্নে রেখে দেবার জন্য। ঢাকা শাহবাগে কালীমূর্তির গলায় নিয়মিতভাবে প্রতিদিন একছড়া জবাফুলের মালা দেওয়ার নিয়ম ছিল। ভাইজী মায়ের আদেশ পালন করলেন। এবং যথাসময়ে সংবাদ এলো ঐদিনটিতে ভুলক্রমে কালীমূর্তিকে জবাফুলের মালা দেওয়া হয়নি। অবশেষে ভক্তপ্রাণ ভাইজী (৺জ্যোতিশচন্দ্র রায়) জানলেন চিনলেন আনন্দময়ী মাকে। সর্বশক্তিময়ী দৈবী পরমেশ্বরী-রূপে। মা যে দিব্যা শক্তিময়ী অনির্বচনীয়া ও দুরতিক্রম্যা! সেই বিশেষ স্থানটিতেই যেখানে জবাফুলের মালাটি পড়ে ছিল আজ স্থাপিত হলো পঞ্চবটি। পাঁচটি বৃক্ষ সেখানে রোপণ করা হলো। ভক্তপ্রবর ডাঃ পান্নালালজীর বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে। সহস্র ভক্ত মানুষের মেলায় মুখর হয়ে উঠলো চুনারের আনন্দময়ী পঞ্চবটি বন। মায়ের উপস্থিতিতে মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো,

নেচে উঠলো সকলে। অবশেষে মা এলেন পাকিস্তানের শরণার্থীদের ক্যাম্পে। সকলকে মিষ্টি প্রসাদ বিতরণ করে আশার বাণী শুনিয়ে ভরসা দিয়ে শক্তি দিয়ে ফিরে এলেন কাশীধামে।

*   *   *

তোমরা গোপাল দেখেছো ? দেখে এসো কি সুন্দর গোপাল এসেছে !

মা বলছেন ভক্তদের। কাশীর আশ্রমে। ঝুলন পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। ইতিমধ্যে আশ্রমে নূতন গোপাল বিগ্রহের আবির্ভাব হয়েছে। আর এই গোপালকে ঘিরেই আনন্দ উৎসব চলছে। আনন্দ·· ···আনন্দ আর আনন্দ। গোপালকে নিয়েই মায়ের আনন্দ আর সেই অনাবিল আনন্দের ছোঁয়াচ এসে লাগছে ভক্তদের প্রাণে প্রাণে। গোপালের পোষাক আভরণ কিছুই নেই। গোপাল যেন নিজেই তার ব্যবস্থা করছেন। স্বপ্ন দেখছেন শ্রীমতী কান্তাবেন। হাসি হাসি মুখে গোপাল তাঁর দিকে চেয়ে হাত পেতে আছেন। যেন গলার হারটি চাইছেন। স্বপ্ন ভেঙে গেল। আবার চোখ বুজেছেন। আবারও ঐ স্বপ্ন। গোপাল হার চাইছেন। দু'দিন ধরে শুধু স্বপ্ন নয় যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে দুষ্টু গোপালের দুষ্টুমীভরা দুই চোখের ইঙ্গিত। আর নবনী-কোমল দুটি হাত। শ্রীমতী কান্তাবেন এসেছেন বোম্বে থেকে। মায়ের বিশেষ ভক্ত। মনে মনে ভাবছেন গোপাল নয়, মা যদি একবার মুখ ফুটে হারটি চান তখনই দিয়ে দিতে রাজী আছেন, কিন্তু গোপালকে নয়। সকাল গেল, দুপুর গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমের বুকে। গোপালের প্রকোষ্ঠে জ্বলে উঠলো গন্ধধূপ। সুরভিত হলো বাতাস। শত শত ভক্ত মানুষের মেলায় মুখর হয়ে উঠলো আশ্রম। ধীরে ধীরে মাও এসে বসলেন একখানি চৌকির উপর। কিন্তু কল্পনাও করতে

পারছেন না কান্তাবেন, তাঁরই চিত্তসুধানিধির দিকে তাকিয়ে আছেন মা আনন্দময়ী। গোপাল নয়, মা'ই যেন দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু কিভাবে দেওয়া যায় এ হার মাকে? এই চিন্তায়ই ব্যাকুল হলো কান্তাবেনের অন্তর। সমস্ত রাত্রিই অতিক্রান্ত হলো। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে হারটিকেও ভাল করে গঙ্গাজলে ধুয়ে ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হলেন মায়ের সম্মুখে। মা তাঁকে দেখেই হাসি হাসি মুখে বললেন, '—যাও, নিজ হাতে গোপালের গলায় পরাইয়া দেও।' শ্রীমতী কান্তাবেনও আনন্দিত চিত্তে পরিয়ে দিলেন নিজের গলার সোনার হার গোপালের গলায়। মনের চঞ্চলতার হলো অবসান। তৃপ্ত হলো আর শান্ত হলো মন। যে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি লাভ করলেন শ্রীমতী কান্তাবেন, সে অমৃতের স্বাদের কাছে পৃথিবীর সব মণিমাণিক্যের স্বাদ যেন তুচ্ছ হয়ে গেল। আনন্দময়ী মায়ের লীলা, না গোপালের লীলা! গোপাল আর মা যে এক! অভেদ! সমস্ত শক্তিবিলাসই যে তাঁরই বিলাস। বিশ্বমূর্তিও তো তাঁরই মূর্ত প্রকাশ। মা যে হ্লাদিনীর সারাৎসাররূপিণী শ্রীরাধারাণী। আবার বাৎসল্য রসের মূর্ত প্রকাশরূপে বালগোপাল। উষার ফুলন্ত জ্যোতি, আবার রাত্রির অব্যক্ত আঁধার। প্রকাশ ও অপ্রকাশের যুগলছন্দে তিনি ছেয়ে আছেন বিশ্বভুবনের সবকিছু। দ্যুলোক তিনিই। পিতা মাতা পৃথিবীরূপিণী। অদিতি। অখণ্ডিতা, অবন্ধনা, নিত্যচেতনা। মা যেমন অমৃতহারিণী সুপর্ণা গায়ত্রী তেমনি আবার তিনি আধারে আধারে প্রচোদয়িত্রী সাবিত্রীর নিত্যদীপ্তি, অসীমের রহস্যসাগরের কূলে বিস্মিত ইন্দ্রচেতনার সম্মুখে আবির্ভূতা বহুশোভমানা 'উমা হৈমবতী'। আবার তিনিই ঈশ্বরশক্তি পরমাপ্রকৃতি যোগমায়া। মহামায়া। অতি মানসী চিন্ময়ী মহাশক্তি। মা সতী, মা চিন্ময়ী, মা আনন্দময়ী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

—'দেখ তো আমার গোপাল কেমন জাগ্রত।' ভক্তদের

বলছেন মা। 'যখন কথা হইল যে কান্তিভাই গোপাল নিয়ে বৃন্দাবন যাবে তখন হঠাৎ টাকার একটা বাহানা করে বৃন্দাবন-আশ্রমে যাওয়াটা বন্ধ করে দিল। আর এখন ঝুলনের সময় যেই এ শরীরটার কাশীতে আসা হয়েছে, ঠিক তখনই গোপালজী একেবারে ঠিক ঠিক দিনে এসে হাজির হলেন। এ সবই তো গোপালের লীলা খেলা। তাই নয় কি ?'

কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমে গোপালজীর আগমনও এক বিচিত্র ঘটনা। কয়েকমাস পূর্বের ব্যাপার, হঠাৎ একদিন বাটুদা আশ্রমে এসে খবর দিলেন বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) একজন জমিদারের বাড়িতে একটি পুরাতন গোপাল বিগ্রহ আছে। অর্থাভাবে তাঁরা সেবা পূজা করতে পারছেন না। গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। মা সবকিছু শুনে বললেন, 'দেখ, তোমাদের আশ্রম তোমরা যদি ভাল মনে কর তবে গোপালকে আশ্রমে নিয়ে এস।' তারপর বৃন্দাবনে যাবার সময় ব্রহ্মচারী কান্তিভাইকে রেখে গেলেন গোপালজী এলে তাঁকে যেন বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে লাগলেন বাটুদা। কয়েকদিন পর বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেল, গোপালজীর পূজারীদের কয়েকশত টাকা মাহিনা বাকী আছে। সে টাকা না পেলে তারা গোপালজীকে ছাড়বে না। এ কথা শুনে স্বামী পরমানন্দ বললেন, 'আমরা এ টাকার বিনিময়ে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে চাইনি। যদি টাকা দিয়েই গোপালকে আনতে হয় তাহলে নূতন মূর্তি আনা হবে।' এ কথায় সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এবং গোপালজীর ব্যাপারও এখানে ইতি হলো। দিন সপ্তাহ মাসও অতিক্রান্ত হলো। লীলাময়ী মা তখন ডেরাডুনে। হঠাৎ একদিন মা'র খেয়াল হলো, টাকার জন্য গোপালজীর আসা হলো না এ কেমন কথা !

মা কোথাও স্থির হয়ে বসেন না। মুক্ত বিহঙ্গমের মত পক্ষ

বিস্তার করে যেন উড়ে চলেছেন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। আবার একদিন চলে এলেন কাশীধামে। অকস্মাৎ বাটুদাও একখানি পত্র নিয়ে এসে মাকে পড়ে শোনালেন, যাঁদের কাছে গোপালজী আছেন তাঁরা এখন বিনা অর্থেই গোপালজীকে দিতে প্রস্তুত। আর দেরী করেননি মা। তৎক্ষণাৎ বাটুদাকে (অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত অগ্নিসত্ত্বা শাস্ত্রী, মন্ত্রাচার্য) নির্দেশ দিলেন গোপাল বিগ্রহকে নিয়ে আসবার জন্য। ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ও বাটুদা গেলেন গোপালজীকে নিয়ে আসতে। মোটরে করে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোপালজীও হাসতে হাসতে চলে এলেন।

ডাঃ পান্নালালজী বললেন মাকে,--আচ্ছা মা, মনে হচ্ছে যেন গোপাল এখনই তোমার কোলে উঠবে ?

মাও মৃদু হেসে বললেন,—আমিও দেখছি পিতাজী, গোপাল বারে বারে এই শরীরটার দিকেই দেখছে আর হাসছে। আবার বলছেন, দেখ গোপাল গঙ্গায় যাওয়ার বাহানা করে এখানে এসে হাজির হলেন। বৃন্দাবন যাবার মতলব নেই। সেই জন্যই এত কাণ্ড হলো।

রাত্রির ঝুলন উৎসবে ভক্তরা যখন মাকে ঝুলনে নিয়ে বসালেন তখন মাও গোপালজীকে পাশে নিয়ে বসালেন। প্রথম রাত্রিতে ত গোপালজী মায়ের ঘরেই রাত্রি যাপন করলো। কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমে ভক্তদের মুখে মুখে এখন গোপালের কথা। গোপাল ছাড়া কথা নাই। গোপাল ছাড়া গীত নাই। গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল, নন্দদুলাল প্রেমগোপাল !

মা'র নির্দেশে সমস্ত আশ্রমটিকেই সাজান হয়েছে। কোথাও গোবর্ধন পর্বত, কোথাও রামলীলার দৃশ্য, কোথাও কংসের কারাগার, কোথাও মথুরার রাজপ্রাসাদ আবার কোথাও যমুনা বয়ে চলেছে। নানা সাজে সেজেছে কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম। মহানন্দে জন্মাষ্টমীর উৎসব পালিত হলো বৈষ্ণবমতে। এখন

চলছে নন্দোৎসব। সমস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে যজ্ঞকুণ্ডের চারদিক ঘুরে ঘুরে নন্দোৎসব চলতে লাগলো। মেয়েরা দইয়ের ভাঁড় নিয়ে কীর্তন করতে করতে ঘুরছেন। তার মধ্যে স্বয়ং মা আনন্দময়ীও রয়েছেন। গোপালজীকে কেন্দ্র করে এই মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছেন সকলে। নামগান কীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছে আশ্রম প্রাঙ্গণ। ভক্তকণ্ঠ হতে উৎসারিত গোপাল কীর্তন, নামগান, যেন সকলেরই হৃদয় প্লাবিত করে নিয়ে চলেছে কোন্ এক পরম পরিতৃপ্তির জগতের দিকে।

সাত

ভগবৎ ক্রিয়াই ক্রিয়া আর সব মৃত্যুপথের ক্রিয়া। আত্মচিন্তাই স্বগতির দিক। জগতের ক্রিয়ায় অরূপ প্রকাশ। হরি চিন্তা ছাড়া আর যা কিছু সব বৃথা। অক্রিয়া। স্বক্রিয়াতে স্থিত হওয়াই কর্তব্য।

মানুষ অভাব রূপেতেই প্রকাশিত। অভাবের চিন্তাই করে। অভাবই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বভাবের চিন্তাই কর্তব্য। নতুবা অভাব। অক্রিয়া। অগতি। দুর্গতি। মৃত্যু। নিজেতে নিজেই। যাতায়াত রূপে সব রূপে তিনিই। আমিই যে আত্মারাম। জ্ঞান-রূপেতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। শুধু তুমিই। তুমিই। তুমিই। সমস্ত কিছুতে তুমিই। আবার তুমি স্বয়ংই। অনন্ত একমাত্র তিনিই। একমাত্র আমিই।

আপনিই করে, আপনিই ফল পায়। আপনার ক্রিয়া দ্বারাই অভাব সৃষ্টি হয়, আবার আপন ক্রিয়া দ্বারাই সেই অভাব দূর হয়। নিজেরই করা নিজের প্রকাশের জন্য। নিজেই বিষয় ভোগ করে, নিজেই আবার ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তাই তো বলা হয় অমৃতভোজী হও বাবা। অমরভোজী। অমর পথে চলো, যেখানে মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই। নিজেই নির্বিষয়ের দিকে চলো।

সেবা বুদ্ধি থাকলে তবেই ভগবৎ সেবায় লাগা যায়। মোহ বুদ্ধিতে মৃত্যু প্রাপ্তি। তাঁর বিধান বড়ই ভাল। সেইজন্য বলা হয়, মহাযাত্রা কর সকলে, যে যাত্রায় যাত্রা বন্ধ হয়। সময় যেন বৃথা নষ্ট না হয়। সব সময় নিজ চিন্তাতেই থাকা। মৃত্যু চিন্তা না করা। যার যে নাম ভাল লাগে। রাম, কৃষ্ণ, শিব, মা,—যে নাম

আসে। সেইজন্যই তো এ শরীরটা বলে, যেখানে নেই রাম সেখানেই ব্যারাম। রাম মানে আত্মারাম। শান্তস্বরূপ। জ্ঞান-স্বরূপ। আত্মস্বরূপ।

শ্রীশ্রীমা বলছেন ভক্তবৃন্দকে। যে যেমন প্রশ্ন করছে তার ভাব অনুযায়ী উত্তর দিচ্ছেন। আবার বলছেন হিমাচল প্রদেশের চীফ্ সেক্রেটারীকে। সস্ত্রীক এসেছেন। মাকে প্রণাম করে মা'র সঙ্গে কথা বলছেন। জীবনদর্শন সম্বন্ধে নানা প্রশ্নও করছেন। 'দেখ বাবা, অশান্তি দুই রকম। দুনিয়ার কাজ করিয়া অশান্তি, আর পরমপথে অগ্রসর হওয়ার অশান্তি। এই অশান্তিই আবার শান্তির একমাত্র উপায়। তিনি যে শান্ত—আত্মা—ভগবান—সেই উপলব্ধি হয়। পরম শান্তির জন্য অশান্তি হইলেই শান্তি পাওয়া যায়। নিত্য আনন্দও তাহাই।' চীফ্ সেক্রেটারী সস্ত্রীক মায়ের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে খুবই প্রীত হলেন।

মা এখন সোলনে। ভক্তপ্রবর রাজাসাহেবের বিশেষ আগ্রহে এসেছেন। নিরিবিলি জায়গা। তেমন ভিড়ভাড় নেই। বিকালের দিকেই ভক্তরা আসেন। কথাবার্তা হয়। মায়ের বিশ্রামও হচ্ছে। এবার জন্মোৎসব ভক্তরা সোলনেই পালন করবেন। দিল্লী সিমলার ভক্তরাও এসে মিলিত হবেন।

একজন ভক্ত এসেছেন মা'র সঙ্গে দেখা করতে। তিনি সরকারী চাকুরে। বর্তমানে পেন্সনভোগী। কথাপ্রসঙ্গে মা বলছেন, 'পিতাজী, সেখানেও পেন্সন পাওয়া যায়। এই পেন্সন ত শুধু শরীরের সঙ্গেই। কিন্তু ঐ পেন্সনের শেষ হয় না। তাঁহার কোন্ কৃপাতে যে পেন্সন হয়ে যাবে তা বলা যায় না। সেই কৃপাই চাইতে হয় যদি কিছু চাওয়ার দরকার থাকে।'

আবার উড়িষ্যার এম. পি. রাজা প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেওকে চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, 'তাঁকে ডাকা কখনও বৃথা যায় না। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া যায় ততক্ষণ ডেকে যাওয়া। আপনাকে

আপনিই ত ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া। অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা, প্রাণের প্রাণ সেই প্রিয়কেই ত ডাকা। কতকাল ভোগকে ডেকে ডেকে ভোগ করে আসা হয়েছে ত। যাঁকে ডাকলে ত্যাগ ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলে যায়, সেই ডাকটি প্রিয় হওয়া চাই।'

ধীরে ধীরে সেই আনন্দোৎসবের দিনটি এসে উপস্থিত হলো। ১৯৫৫ সনের ৩রা মে। বাংলা বৈশাখ মাস। প্রভাতসূর্যের স্বর্ণ-কিরণ এসে নৃত্য সুরু করে দিল মায়ের গৃহপ্রাঙ্গণে। নৃত্য করে চলে ধূলিকণারা। ঘুর্ণির পর ঘুর্ণি সৃষ্টি করে চলে তারা। তারই সঙ্গে চলেছে যেন হাসি-অশ্রু-দুঃখ-বেদনা ভরা কত শত ভক্তের প্রার্থনা আশা-আকাঙ্ক্ষা। সেই বিশৃঙ্খল ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে নজরে পড়ে স্নেহভরা মা-আনন্দময়ীর মুখখানি। সেই মুহূর্তে ভক্তহৃদয়ে জেগে ওঠে আনন্দের বন্যা। আনন্দ···আনন্দ··· আনন্দ···ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার···। অনন্ত আশার অনাদি ভাণ্ডার যে, মা-আনন্দময়ী! বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা!

সুরু হলো চণ্ডীপাঠ, ভাগবৎ পাঠ, রামায়ণ পাঠ, লক্ষ শিবমন্ত্র জপ। নিদ্রাভঙ্গ হলে লছ্‌মীজী শ্রীশ্রীমাকে একখানি সুন্দর চাদর জড়িয়ে দিলেন গায়ে। ভোগও দিলেন। ওদিকে আকাশের অবস্থা ভাল না। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি সুরু হলো। চিন্তিত হলেন ভক্তবৃন্দ। রাজাসাহেব। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুন্দর মণ্ডপ ও প্যাণ্ডেল সাজানো হয়েছে। বৃষ্টিতে যে সবই পণ্ড হবার উপক্রম। সকলেরই মন ক্ষুণ্ণ। মা'র মুখে কিন্তু মৃদু মৃদু হাসি।

রাজাসাহেব বললেন, আমরা চিন্তিত, আর মাতাজী যে হাসছেন! ভক্তরা বলছেন সবই লীলাময়ী মায়ের লীলা। মা'র জন্মোৎসবে প্রায়ই এইরকম হয়, আবার সবই ঠিক ঠিক হয়ে যায়। আমরা ত দেখে আসছি।

এইভাবে দুপুর গেল। বিকেলের দিকে আকাশ শান্ত হয়ে এলো। বাইরে দিবসের আলোও ধীরে ধীরে হয়ে আসে ম্লান। মা এসে বারান্দায় বসলেন। তখন অখণ্ড নাম কীর্তন চলছে। 'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি বোল। মধুর মধুর গৌর কিশোর মধুর মধুর নাট। মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট। মধুর মধুর কয়গো কথা শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা, চাঁদে যেন উগারয়ে সুধাগো। চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দুলিয়ে চলে যায়, কপাল মাঝে ভুবনমোহন ফোঁটাগো।'

ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মাও ভাবানন্দে বিভোর। আনন্দঘন মূর্তি ধারণ করলেন। অনির্বচনীয় মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা যেন। সে মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠলো। বহু বিশিষ্ট ভক্তও এসেছেন। টিহরীর মহারাজা মহারাণী, ভক্তিমতী রমণী লীলাবেন। বম্বে থেকে মিঃ মেহতা। শ্রীযুত বি. কে. শাহ সপরিবারে এসেছেন। দিল্লী থেকে ডাঃ বলরাম, শ্রীযুত আগরওয়ালজী, শ্রীপঙ্কজ সেন, সোলনের কলেক্টর সাহেব। হিমাচলের গভর্নর, ভদ্রীর রাজাসাহেবও এসেছেন। ইনি বাল্যকাল থেকেই মা'র পরিচিত। সিমলা থেকে শ্রীরাজাগোপালন ও আরও অনেকে এসেছেন। দিল্লী সিমলার বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও উপস্থিত হয়ে জন্মোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। ধনী দরিদ্র রাজা মহারাজা গভর্নর, মন্ত্রী, এম. পি. সকলেই মা'র কাছে যেমন আসছেন, মায়ের কৃপাও তাঁদের উপর সমভাবেই বর্ষিত হচ্ছে। মায়ের কৃপা যে কি ভাবে ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া করে যায় তা যাঁরা মরমী ভক্ত তাঁরাই অনুভব করেন মর্মে মর্মে। তাঁদের জীবনের প্রতিটি কর্মে। জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশী থেকে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ একখানি সুন্দর চিঠি লিখেছেন। সে চিঠি মাকে পড়ে শোনান হলো। 'সত্যই যে অখণ্ড প্রকাশরূপিনী

মা জগতে প্রকট হইয়াছেন ইহাই যেন তাঁহার জন্মোৎসবের দিন আমরা স্মরণ করি। বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম কোথায়? স্বয়ং-প্রকাশ-রূপিনী এবার আড়াল ভাঙিয়া নিজগুণে প্রকাশিত হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।···চিরপ্রকাশমান সত্য যেন আড়াল ভাঙিয়া নিজ বলেই নিজেকে প্রকাশ করে—ইহারই প্রতীক্ষা। বস্তুতঃ সেখানে আড়াল কোথায়? আবার আড়াল গড়িয়াছেনও তিনি—ভাঙিবেনও তিনি। আবার ভাঙাগড়ার অন্তরালে হাসিয়া খেলা খেলিতেছেনও তিনি। তাহা ছাড়া আড়ালেও তিনিই। এই আড়ালের দ্বারা যে কৃত্রিম গণ্ডী প্রকাশ হইয়াছে তাহা কি তিনি নন? সবই যে তিনি। সবের উর্ধ্বেও তিনি। তিনিই ত তুমি। আবার তুমিই বা কে? আমিই ত। আমি ছাড়া আর কি-ই বা আছে। আবার সেখানে আমিই বা কোথায়? মা, চোখের ঠুলি খুলিয়া দেও। বুঝার বোঝা সরাইয়া দেও। কথার পালা শেষ করিয়া দেও। মা গুরু নিজে সবই সেই একই স্বয়ং। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আর কত দিন জড়াইয়া থাকিব? তোমার জন্মদিন—সকলে উৎসব করিবে। আনন্দে জয়গান গাহিবে। কিন্তু একটি চিরবিরহকাতর হৃদয় তোমার সেই মহা আবির্ভাবের দিকে তাকাইয়া আছে। যখন সে তোমাকে আমি বলিয়া চিনিতে পারিবে—চিনিয়া চমকিত হইবে। অতি পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের আড়াল আর কতদিন?'

মা তখনও আত্মানন্দে বিভোর। মুখমণ্ডলে ফুটে রয়েছে নির্মল-পাবন জ্যোতি। দৈবীভাবের স্বতঃস্ফূর্ত লক্ষণাদি তাঁর দেহ-সীমার মধ্যে সীমাতীতের অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠছে।

আবার আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। প্যাণ্ডেলের মধ্যে সব কিছু ভিজে একাকার। তার মধ্যেই সৎসঙ্গ চলছে। কৃষ্ণানন্দ অবধূতজীও আছেন। নানা কথা নানা আলোচনা চলছে। মা

বলছেন, বৃষ্টিতে তোমাদের নষ্ট ত কিছুই হয় নাই। শুধু তোমাদের বসিতে কিছু অসুবিধা হইয়াছে।

প্রত্যুত্তরে যোগীভাই বললেন, হ্যাঁ, সেইটুকুই অপরাধ রহিয়া গিয়াছে।

এই কথায় সকলেই হেসে উঠলেন। মাও হাসলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্রহ্মচারী কুসুমভাই পূজা আরম্ভ করলেন। অবধূতজী এসে মণ্ডপে বসলেন। বিশিষ্ট ভক্তরাও বসে আছেন। মঞ্চের দুই দিকে চৌকির উপর ১০৮ পদের ভোগ সাজান হয়েছে। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ধারা আঘাত করে চলেছে প্যাণ্ডেলে। কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তবুও সকলে স্থির হয়ে বসে আছেন। শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা দেখছেন। মা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কপালটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। সকাল সাড়ে চারটার পর পূজা সমাপ্ত হলে, ভোগ নিবেদন করা হলো। তারপর আরতি হলো। ধীরে ধীরে উষার আলো ফুটে উঠলো আকাশের বুকে। বৃষ্টির ধারাও বন্ধ হয়েছে। আলোকিত হয়ে উঠলো আকাশের রাজ্য। ভক্তদের মন। তাদের মন যেন বলছে, 'সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি।'

আট

পাথর দেখলে বিগ্রহ নাই। আর বিগ্রহ দেখ ত পাথর নাই। ভগবৎ বিগ্রহ ভাবনা যেখানে আনবে সেইখানেই ভগবান বিরাজ করেন। যেমন বলে না সমস্তই ভগবানের বিগ্রহ। আর যদি ভগবৎ বিগ্রহ বলা যায় তবে তা প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করাও উচিত।

পাথর বুদ্ধি থাকলে দুর্বুদ্ধি, ভগবৎ বুদ্ধি হলো না। এইজন্য ভগবান কোথায়—এই যে অনুসন্ধান। হরেকরূপে এক ভগবানই, —ইহা অনুভব করবার, প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দুনিয়ার বিষয়রসে যে বুদ্ধি—বিষয়বুদ্ধি। নিত্যরূপ নয়, অনিত্যরূপ। কিন্তু যেখানে একমাত্র ভগবৎপ্রকাশ সেখানে অনিত্যের কথা নাই। তোমার দৃষ্টি সৃষ্টির মধ্যে নিত্য নাই। পরিবর্তনশীল। ইহাই জগৎ বুদ্ধি। ইহাতে কি প্রকাশ হয়? নাশ। যাহা নাশ হয়, যেখানে স্ব-প্রকাশ নাই। সেখানে স্বয়ং-স্বরূপ কোথায়? ওখানে ত নাশ—নাশ হয় না। নাশ—নাশ হওয়া চাই।

বিষয় বাসনায় মন থাকলে, তার স্বভাবই মনকে বিকল করা। এইজন্যই চেষ্টা করা। অভ্যাস করা। যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান জপে মন না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান জপের চেষ্টা করে যাওয়া। পরিমিত নিদ্রা ভোজন ইত্যাদির প্রয়োজন। দেখ, যখন কোথাও যাত্রা কর যতটা প্রয়োজন মাত্র ততটাই সঙ্গে নেও। ঘর হতে সবটাই ত আর নেও না। এইজন্য ভগবৎ পথে যাত্রা করলে ভগবৎ-মুখী অনুকূলতার জন্য আহার নিদ্রা যতটা প্রয়োজন ততটাই নেওয়া। যেমন বলে না, 'যেমন খাইবে তেমন মন হইবে।' মন যে বড় চঞ্চল।

চঞ্চল মন সর্বদাই বাইরের দিকে টেনে নেবে, অন্তর্মুখী হতে দেবে না। তাই তো বলা হয়, মাসে একদিন বা চারদিন কিংবা সপ্তাহে একদিন পরমার্থ চিন্তা করা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারে বারে চেষ্টা করা, মনকে তাঁর দিকে লাগাবার জন্যই জপ ধ্যান পূজা পাঠ কীর্তন ইত্যাদি করা। এইরূপ চেষ্টার ফল শুভ হইবেই। তোমার অখণ্ডরূপে বাসনা ভোগ করবার যে ইচ্ছা রয়েছে। জন্মে জন্মে যেরূপটা হয়ে আসছে, তা খণ্ডিত হয়ে যাবে। তখন তোমার মন একেবারে না লেগে গেলেও, তোমার চেষ্টার ফলে আশা ঐ দিকে কখনও লাগিয়াও যাইতে পারে। বিষয়ে মন এতটা দিয়াছ, এখন ভগবানের দিকে একটু মন লাগাও। দেখবে ধীরে ধীরে তোমার রাস্তা নিশ্চয়ই খুলিয়া যাইবে। বিষয় চিন্তাও ছাড়িয়া যাইবে। আবরণ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। উহা নিত্য কিনা। অনিত্য যাহা তাহা বিনাশ হইবেই। যেমন অগ্নির স্বভাব তাপ দেওয়া। অগ্নির নিকট যাবে আর ঠাণ্ডা লাগবে এ তো হয় না। বরফের কাছে যাবে আর গরম লাগবে ইহাও হয় না। এইজন্য ভগবানের নাম সর্বনাম সর্বরূপ। ভগবৎ নামেতে পাপ হরণ করে। বলা হয়, মানুষ এত পাপ করিতে পারে না যা ভগবৎ নামে দূর হয় না। ঠিক যেমন একটি অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যতটা জ্বালাইতে পারে, ততটা পদার্থ তুমি সংগ্রহও করিতে পার না। ভগবৎ চিন্তন ভগবানের দিকে যাবার যে চেষ্টা তাতে তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া দিবে। নাশ—নাশ হইবে, স্বরূপ প্রকাশ হইবে। এইজন্য বিষয় বাসনা যাতে তুমি একেবারে ডুবে আছ, তা হতে মুক্ত হবার জন্যই যখন তুমি ভগবানের দিকে লাগিয়া যাইবে তখন তোমার অন্তঃশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। মন লাগুক আর না লাগুক ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে বাঁধিয়া ফেল। এতটা সময় আমি ভগবৎ চিন্তায় দিবই। আশা—যে কখনও মন লাগিয়া যাইবে। এবং লাগিয়া থাকেও।

যেমন মহাত্মারা বলে থাকেন, শাস্ত্রও বলে,—পরমার্থ চিন্তনের জন্য লাগিয়া যাইবে আর তোমার মিলিবে না, এমন কখনও হয় না। হইতে পারে না। চেষ্টা, যতক্ষণ না মিলে, চেষ্টা ছাড়া নাই। সত্যস্বরূপ ভগবান ত তোমার মধ্যেই রয়েছেন। এইজন্যই আত্ম-চিন্তা। আপন চিন্তন, আপন ধ্যান ছাড়া না। আপন বস্তু আপনাকে পাওয়ার জন্য। আনন্দ আনন্দই। নিরানন্দ আর কোথায় ? ঐ-ই আছেন মাত্র।

ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা বলছেন। একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মা বলে চলেছেন। সোলনে। এমন সাবলীল প্রাণস্পর্শী উত্তরটি পেয়ে ভক্তটিও মুগ্ধ হলেন। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী।

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন,—মা, ধর্ম কি ? প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, আপনাকে পাওয়ার যে রাস্তা, যা ছাড়া যায় না, তাই ধর্ম। প্রত্যেকেরই প্রকাশিত হবার জন্য পৃথক পৃথক রাস্তা আছে। যেখানে তুমি আছ সেইখান নিয়াই তুমি চল। একমাত্র তিনিই ত। তিনিই ধরে আছেন। ছাড়া ত নাই। আবার ভগবৎ প্রকাশের ক্রিয়াকেই ধর্ম বলা হয়। যা অক্রিয়া তাই অধর্ম। ধর্ম ত একই।

আবার বলছেন,—মানুষ কর্ম পূরণের জন্য জন্ম নেয়। আবার জন্ম পূরণের জন্যও জন্ম নেয়। শক্তিশালী পুরুষ যাঁর মধ্যে ভগবৎ শক্তি প্রকাশিত রয়েছে তিনি নিজের কর্ম নিজেও বদল করতে পারেন। তাই তো সর্বদাই বলা হয়, ভগবৎ চিন্তা হতে বড় আর কিছুই নাই। এইজন্য একটি কথা, গৃহস্থাশ্রমে থেকে বালগোপাল সেবা, কুমারী সেবা। পত্নী গৃহলক্ষ্মী—পতি পরমপতি এই ভাবনাতে সেবা। পিতামাতা গুরুজন তাঁদেরও সেবা। সেবা সেবা সেবা। এই সেবা-ভাব নিয়েই সংসারে থাকা। তাহলেই সংসার হবে শান্তির সংসার। যেখানে শান্তি, শান্ত অবস্থা, সেখানেই ভগবান

বিরাজ করেন। সেবা বুদ্ধিতে সংসারে থাকা আর কি। নিজের বাড়ি যেন ঠাকুরের মন্দির। বাড়িতে যাঁরা আছেন সকলেই এক একটি বিগ্রহ। আমার কাজ সেবা করা। আমি ম্যানেজার হয়ে সেবক হয়ে থাকবো। এই সেবা ভাবনাই একদিন ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত হয়ে পাকা সেবক হয়ে যাবে। তখনই ভগবানকে পাওয়ার পথ খুলে যাবে। ভগবানকে পাওয়ার ইহাও এক উপায়।

কথা শেষে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কলকাতা থেকে এসেছেন মায়ের ভক্ত গায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। ভক্তিমতী ও শুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্টা মায়ের স্নেহধন্য। তিনি কয়েকখানি ভক্তিমূলক গান শোনালেন। কি সে ভাব! কি সে সুর!

মৌনের পর মা আবার ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে কথাবার্তা সুরু করলেন। কঠিন তত্ত্বকে মা এমন সহজ করে সরল ভাষায় বলছেন, মনে হয় যেন সত্যস্বরূপ বাণীরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। স্বতোৎসারিত বাণীর অর্থসমৃদ্ধিতে বিদ্বৎমণ্ডলীও স্তম্ভিত হচ্ছেন। কারণ বাইরের দিক থেকে মা তো আর লেখাপড়া জানেন না। মাও অনেক সময় হেসে হেসে বলেন, বাবা, এ মেয়েটাকে তো আর লেখাপড়া শেখাওনি তাই আবোল তাবোল কি সব কথা বলে।

শ্রীশ্রীমা আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, অভয় দিয়ে, দুর্বল মানুষকে ডেকে বলছেন,—তুমি দুর্বল নও, তোমার ভিতরেই সব। তুমি যে অমৃত! অমর। সেটা প্রকাশ কর। অমর পথে চল। অমরপন্থী হও। মৃত্যুপন্থী হয়ো না।

মনুষ্যজন্ম পেয়েও যদি সেই পথে যাওয়ার চেষ্টা না কর তবে পশুপক্ষী হতে প্রভেদ কি? আপনার প্রকাশের জন্যই নিজের কল্যাণের দিকে, ভগবানের দিকে যাওয়া উচিত। ভগবৎ প্রাপ্তির রাস্তা সরল সহজই। মন্ত্র জপ করো। কোন্ মন্ত্র? গুরু যা বলবেন তাই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ঠিক ঠিক গুরুমন্ত্র জপ করলে প্রকাশ ছাড়া

হতেই পারে না। ভগবানের রাজ্য এমন সুন্দর। তিনি নিজে যদি পড়ান তবে পাশ না হয়েই যায় না। গুরু শক্তি প্রকাশ হলে ফেল আর হয় না। আগুনে প্রবেশ করলে জ্বলবেই। সর্বনাম সর্বরূপ আবার অনাম অরূপ। তিনিই সসীম আবার তিনিই অসীম। তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও তিনি। যে নাম ভাল লাগে, সর্বনাম সর্বরূপ ত আছেই। আবার যদি নিরাকার ভাল লাগে তবে অনামী অরূপ। তাঁর সঙ্গে দোকানদারী ব্যাপার বৈশ্যবৃত্তি না রাখা। এতদিন ধরে ধ্যান করলাম, কিছু পেলাম না, এ বুদ্ধি রাখতে নেই। ধৈর্য ধরে প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা। তিনি যে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। আপনের আপন। প্রকাশ না হয়েই যায় না। আবার বলছেন, নাম নামী অভিন্ন। স্বয়ং তিনিই যে নামরূপ। অক্ষর ভগবানেরই রূপ। যে নাম করলে চৈতন্য হয়। বীজ বপন করলে যেমন বৃক্ষ জন্মায়। যে নাম ভাল লাগে সেই নাম নিতে নিতে সর্বনাম যে তাঁরই নাম, সর্বরূপ যে তাঁরই রূপ, তাহা প্রকাশ হয়। আবার তিনি যে অনামী অরূপ তাও ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়।

গুরু ভিতর হতেই হয়। বাইরে কিছুই নেই। সবই ভিতরে। আসল খোঁজ আস্‌লে আসল প্রকাশ হয়। বিনা প্রকাশ ছাড়া যে থাকাই যায় না। তিনিই স্বয়ং গুরুরূপে এসে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে দেন। প্রকাশিত হয়ে যান।

যা বলো তা বলো সরল বিশ্বাস রাখা। আমার মধ্যে যে বীজ আছে তাতে বৃক্ষ হবেই এই বিশ্বাস রাখা। বীজ বপন করলে যেমন জল দিতে হয়, সার দিতে হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গরূপী সার ও জল দিয়ে মন্ত্ররূপী বীজকে অঙ্কুরিত করতে হয়। যে রকমটা চাইবে সেইরূপই পাওয়া যায়। বিগ্রহকে, নামকে ছেড়ে না থাকা। সর্বদাই নাম নিয়ে থাকা। ভগবানের সঙ্গে দোকানদারী না করা। যতটা জল দেবে, সার দেবে ঠিক ততটাই অর্থাৎ সেই

অনুপাতেই বৃক্ষ জন্মাবে। শীঘ্র বীজ থেকে গাছ না বেরুলে দোষ নিজেরই। বৃক্ষের নয়। অর্থাৎ তাঁর চরণে পূর্ণরূপে অর্পিত হতে পারছো না।

তোমার তীব্র ইচ্ছা আছে আর প্রকাশ হয় না, ইহা তো হইতেই পারে না। রাস্তা লম্বা কি ছোট এ প্রশ্ন মনেও স্থান দিতে নাই। আমাকে পাইতে হবেই। এই ভাবনাই রাখা। তোমার পূর্ণ শক্তি তুমি লাগাও, তবে ত তুমি পাবে। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা এই বোধ রাখতে হয়। তিনি কি না দিয়া পারেন ?

হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। তুমি না থাকলে আমি কোথায় ? অহং+কার। অহং ক্রিয়ারূপে যাহা প্রকাশ তাহাই অহংকার। এই অহংকার তাঁরই। অহংকে তাঁর দিকেই নিয়ে যাওয়া। তাই তো বলা হয় আমি যেন তুমি হয়ে ওঠে। এই অহংকার কিছুতেই যায় না। একটা কিছু শক্তি হলো অমনি অহংকার। এমন যে ভক্তি তার পর্যন্ত অহংকার আছে। —আমার মত ভক্ত কজন আছে! সবকিছু ত্যাগ করে এসেও রিক্ততার অহংকার। গৈরিক পরারও অহংকার। তাই তো সর্বদাই প্রার্থনা করা আমার এই অহংকে উৎপাটিত করো, উন্মূলিত করো। আমি যেন তুমি হয়ে ওঠে। তোমার পর আর কিছু হবার নেই। তুমি নেই—এই বিরহে আমার বিশ্বভুবন যখন শূন্যময় হয়ে উঠবে তখনই আমার বিকাশের সম্ভাবনা ঘটবে। আর সেই শূন্যের আশ্রয়ে এসে 'আমি' ধীরে ধীরে 'তুমি' হয়ে উঠবে।

আত্মা এক আত্মাই ত। তবুও আমার তোমার এই সব। 'আমি' যখন কিছুতেই যেতে চায় না, তখন ভগবানের নিত্যদাস আমি এই ভাবনা নিয়ে থাকাই ভাল। সেখানে অনিত্যরূপে অহংকারের খেলা—ত্যাগ হওয়ার যা তা ত্যাগ হয়ে যায়। যেমন জলের গতি, উপরে দেখলে মনে হয় গঙ্গার জল যেন স্থির

রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্ষণেই প্রবাহ বয়ে চলেছে। জগৎ ত গতিশীল, যেখানে গতি ঐ জগৎ। তুমি ছোট ছিলে বদলিয়ে গিয়েছো, যুবক হয়েছ, আবার বার্ধক্য আসবে। দেখ, সব সময়ই ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। সব সময় তাঁকে আশ্রয় করে থাকলে অহং বোধটুকুও থাকবে না।

একজন প্রশ্ন করলেন, প্রথমেই কি সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে না ভগবৎ অনুরাগের পর এই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, যেমন যেমন ত্যাগ হতে থাকে অর্থাৎ যতটা ভগবৎ অনুরাগ হয় ততটাই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসে। ভগবানে মন লাগান মানে, ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হওয়া। আর বৈরাগ্য হওয়া মানে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হওয়া আর বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসা এক সঙ্গেই হয়। ত্যাগ হয়ে যায়। ত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় না। এই ত্যাগই আসল ত্যাগ। এই ত্যাগে আর অহং বোধই থাকে না। থাকতে পারে না।

এর অর্থ তাহলে প্রথমে আকর্ষণ পরে বৈরাগ্যের উৎপত্তি। তাই নয় কি?

—আগে পরে না। ভগবৎ আকর্ষণের সাথে সাথেই বিষয় ত্যাগ হতে থাকে। হয়ে যায়। মা বলছেন হেসে হেসে, সহজ করে সরল ভাষায়।

আবার বলছেন, এই শরীরের নিকট উৎপটাং কথা কিছু শুনতে চাও ত শোনো। এবারে কৃষ্ণানন্দ অবধূতজীকে লক্ষ্য করে বলছেন, পিতাজী কেমন সুন্দর বুঝিয়ে বলেন। কাল কথা হচ্ছিল ভগবানের মায়া কখন আসলো? মায়ার সৃষ্টি কখন হলো?

যতক্ষণ ভগবান ততক্ষণই তাঁর মায়া। তুমি ত পরমানন্দকে ত্যাগ করে আছ। তুমিই ত ত্যাগী। মহানকে ত্যাগ করে তুমি মহাত্যাগী!

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও হেসে উঠলেন। মায়ের রসিকতায়।

এবারে ধীর গম্ভীরকণ্ঠে মা বলছেন,—'ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দ ইহা কখনও ত্যাগ হতেই পারে না। পর্দাতে আবরণ রয়েছে শুধুমাত্র। উহা ত স্বয়ংপ্রকাশ। নিত্য। কখনও পরিবর্তন হয় না। যা ত্যাগ হবার তাই ত্যাগ হয়।

যখন হতে ভগবান তখন হতেই মায়া। ভগবান কখন নেই? এইজন্য মায়াও অনাদি। অন্ত কোথায়? কিসের আকর্ষণ? কার প্রকাশ? বিচার কর। আপন যা তার যখন প্রকাশ হলো, তবে মায়া কার? নিজকে পাবার চেষ্টা করা, চাই দাসরূপে। চাই আত্মারূপে। তুমি ত অমৃত। আত্মারাম। জন্ম মৃত্যুর ভোগ কেন তবে? যেখানে কারো উৎপত্তিই হলো না, ওখানে কি করে বদ্ধ হলে? অমৃত, আত্মারামের প্রকাশের জন্য—আবরণ হটাবার, অপসারিত করবার চেষ্টা করা। নিজের মধ্যেই নিজে। যেখানে আত্মা সেখানে 'আমি' থাকে কি করে? আমার তোমার মধ্যেই আমি থাকে না। ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্তন-রূপে, অপরিবর্তনরূপে তিনিই স্বয়ং। আপনাতে যে আপনিই রয়েছে তার প্রকাশের জন্য সব কিছু করা। আবরণ হটাবার চেষ্টা কর। অমরপন্থী হয়ে যাও। অমৃতের পথে চলবার চেষ্টা কর।'

একজন যুবককে লক্ষ্য করে মা বলছেন, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে ত কত জন্ম কাটালে। বৃথা সময় আর নষ্ট করো না। আমিই যে অমৃত এই ভাবনা নিয়ে কর্ম করা। কর্ম যেরূপ ফলও সেইরূপ। তবে ভগবৎ চিন্তা দ্বারা মানুষ নির্ভয় হয়। তিনি যে প্রাণের প্রাণ। আত্মা। অভয়। সৎসঙ্গে হোক, একান্তে হোক যখন যেখানেই থাকা তাঁকেই ডাকা। নতুবা আবরণ মুক্ত হবে কেমন করে? আত্মস্বরূপ তোমার কাছে প্রকাশ হবে কেমন করে?

একজন ভক্তিমতী রমণী বলছেন, যখন জপ ধ্যান করতে বসি তখন বাচ্চারা বিরক্ত করে। তখন কিভাবে নাম করবো?

মা বলছেন, বালগোপাল ভাবে নিতে হয়। তারা বিরক্ত করে

এভাবই নিতে নেই। সেবা ভাবে নেও। বালগোপাল সেবা করে যে সময়টা পাওয়া যায় সেই সময়ে জপ ধ্যান কর। শোবার সময়টা তো পাও ? তা হতে অন্তত কিছুটা সময় ভগবানকে দেবে।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন, আসা যাওয়া হতে মুক্তির উপায় কি ?

'আসা যাওয়া নেই-ই। আমি যে আত্মা এই ভাবটা রাখা। আসা যাওয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে হয়। কোথায় আসা ? কোথায় যাওয়া ? যাঁহার আশ্রয় নিলে মুক্তি তিনিই সর্বত্র স্বয়ং আছেন।' প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমা বললেন।

আবার ভক্তপ্রবর শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজের পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, 'একমাত্র তিনিই আছেন বলে তাঁর প্রকাশের জন্য তাঁরই বলা তাঁকেই ত। গতি ও স্থিতি রূপেতে যিনি আবার তিনিই অক্ষর রূপেতে—যার ক্ষরণ হয় না। ভাষায় এবং সেই গভীরেও তিনিই ত। গতির মধ্যে সহজ গতিতেও, সর্বক্ষণ যেখানে অচল থেকেও সচল। আবার অভাব রাজ্যের বীরত্ব যেখানে সর্বক্ষণ, সেই বীরত্বের ধ্বংস রূপটাও প্রকাশ গ্রহণ চাই ত। উহা কি দিয়ে ? যত কথার ভাণ্ডার যে আবার সে-ই। সেইজন্য যে ভাণ্ডারের আশ্রয় নিলে বৃথা ফল, বৃথা ভোগ, বৃথা রূপটি—তার বৃথা হয়ে প্রকাশ পায়, যদিও বৃথা রূপও ওই ত। সেখানে ভাণ্ডার অভাণ্ডারের প্রশ্ন নেই। বৃথা অবৃথার প্রশ্ন নেই। কিছু না থেকেও সেখানে সব আছে। আপন স্বরূপ—আপনাতে আপনিই। যে মনে যা নিজ লক্ষ্যে মেনে চলা যায়। সেইটি ধরে চলতে হয় ত। যেখানে হাহাকারের রাস্তা। সেই ক্রিয়াটি সর্বক্ষণ জাগ্রত রাখার জন্য স্বক্রিয়াই প্রয়োজন। যে রসাল ভাষা কথা আপনারই প্রকাশের দিক সেই দিকটাই গ্রহণীয়। পিপাসিত জনের যেমন জল পান করতে ভুল হয় না, সেইরূপ ঐ লক্ষ্যে নিজকে জাগ্রত রাখার কেবল চেষ্টা।'

মা আনন্দময়ী যে—মুক্তপ্রাণ। মুক্তপ্রাণের মুক্তবাণী! সংশয় নেই, সঙ্কোচ নেই, আড়ষ্টতা নেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যস্বরূপ যেন প্রকাশিত হচ্ছেন বাণীরূপে। এ যেন ভক্ত-বিহ্বল ভগবান ভক্তি-বিহ্বল করে তুলেছেন তাঁরই আত্মা দিয়ে গড়া জীবকে, ভক্তিদেবীর ভজনায় বিভোর করে তুলবার জন্য। ভাষায় ভাবে ছন্দে বইছে পতিতপাবনের তারক তেজ, বিপুল গগনে দিগন্ত-ব্যাপী আকাশবাণী যেন মুখরিত ওই—ভয়ানাং ভয়ং অভয়ের। উত্তীর্ণ হলো পাতকী যত, পতিত যত হতাশায় নিরাশায় আচ্ছন্ন যত দুর্বল হৃদয়ের যত পড়েছিল তীরে, কণ্টকাকীর্ণ, কঙ্করময়, কর্দমময় ভবনদীর চরে, সকলের জন্যই যেন কূলে এসে ভিড়লো যোজনব্যাপী এক জলযান। কেহ রবে না আর পড়ে এখানে, এই আঁধারে শীতে কুজ্ঝটিকায়। সকলকেই যেন ডেকে ডেকে তুলছেন কর্ণধার। আর বলছেন, ওরে ভয় নাই, তোরা নাম কর্, নামেই সব হয়। হরিকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। তোরা যে আমার ভক্ত। আমার ভক্তের ত বিনাশ নাই, ব্যর্থতা নাই, বিফলতা নাই, —নাই তাদের বিপন্নতা। নামেতেই আমি তার আত্মাকে করি ধর্মময়, প্রাণে প্রাণে বাহিত করে দিই শান্তি। প্রত্যয়প্রবাহকে প্রবাহিত করে দিই সত্যলোকে সত্যবোধে, আত্মবোধের প্রাণবন্ত দীপ্ত জ্যোতির মণ্ডলে। সেখানে ধ্বংস নাই বিনাশ নাই দুরাচার নাই—নাই মৃত্যু। তাই তো বলি ডাক্ শুধু ভগবান শুধু নারায়ণ শুধু বিশ্বযামী—বাসুদেব, শুধু মা।

'মা' মানে ময়। বিশ্বময় তিনিই যে। মা ছাড়া ত আর কিছুই নাই। মা-ই ত সব দিতেছেন। মা-ই ত গুরু। মা যিনি মাপিয়া দেন। মাকে জানা মানে মাকে পাওয়া আর মা হয়ে যাওয়া। মা নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। বহির্জগতের ভাব লুপ্ত হয়। নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা হতেই ফুটে ওঠে।

নয়

'ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থায় সাধিকার দর্শনলাভ আমার আগে কখনও ঘটেনি। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল, তাতে করেই তাঁব নাম হয়েছে, 'আনন্দময়ী মা'। সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণকেশপাশ অবগুণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে লুটিয়ে পড়েছে। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা—তৃতীয় নেত্রের প্রতীক। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে তাঁব সদাজাগ্রত। ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট তুটি হাত আর ছোট্ট তুটি পা—তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য।'*

বলছেন পরমহংস যোগানন্দ। কলকাতায় ভবানীপুরে আনন্দময়ী মাকে প্রথম দর্শন করেন। সনাতন ধর্মের বাণীপ্রচারকল্পে তিনি আমেরিকায় গমন করেন ১৯২০ সালে। এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্নস্থানে তিনি যোগদা মঠ—সৎসঙ্গ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ বিলিজিয়াস লিবারেলস্-এর ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আহূত হয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা উপদেশ ও যোগশিক্ষাপ্রণালী সর্বত্রই এতদূর লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েন। তাঁর গুরু ছিলেন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজ। শৈশবে মাতৃগুরু যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী শিশু যোগানন্দকে কোলে নিয়ে ওঁর মাকে বলেছিলেন, 'মা জননি, তোমার ছেলে একটি যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে

* অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী—পরমহংস যোগানন্দ। (যোগিকথামৃত)

নিয়ে যাবে।' শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী একদিন সত্য হয়ে ফুটে উঠেছিল ওঁর জীবনে। স্বামী বিবেকানন্দের পর আমেরিকা মহাদেশে ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন উদারতা ও তার মহাসত্যকে উদাত্ত গম্ভীরস্বরে প্রচার করেন স্বামী যোগানন্দ। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহকে তাদের বিভিন্ন কর্মপন্থা, বিচিত্র জীবনধারা, নানা মত ও পথ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক যোগসূত্রে আবদ্ধ করে ঈশ্বর ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। এই যোগানন্দ পরমহংসকে প্রথম দর্শন করে আনন্দময়ী মা বলছেন, 'বাবা, এ জীবনে আজ আমি আপনাকে এই প্রথম দেখছি। কত যুগযুগান্তর পরে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ী মা সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন। শরীর স্থির, নিশ্চল স্থাণুবৎ। সুন্দর ছুটি চক্ষু তাঁর আকাশের দিকে অর্ধোন্মীলিত, দৃষ্টি স্থির হয়ে এসে নিবদ্ধ হলো নিকট-সুদূর অন্তরের স্বর্গরাজ্যে।

* * *

স্বামী যোগানন্দের ভাষায়—

—'আমি টের পেলুম যে তখন তিনি সমাধির খুব উচ্চাবস্থায় রয়েছেন। বাইরে নারীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি শাশ্বত আত্মা। সেই স্তর থেকে তিনি আর একটি ঈশ্বরভক্তকে সানন্দে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছেন।

ব্রহ্মানন্দ সাগরে অবগাহন করে আনন্দময়ী মা এখন যেন জড়-জগতে ফিরে এলেন।

বাবা বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন? তাঁর স্বর অতি পরিষ্কার যেন সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার।

বর্তমানে কলকাতা কিম্বা রাঁচি। কিন্তু শীগগিরই আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি।

স্বামী যোগানন্দের 'যোগদা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে' রাঁচীতে এসেছিলেন আনন্দময়ী মা। আশ্রম পরিদর্শন করে মা আনন্দিত চিত্তে বললেন, 'এ জায়গাটি তো ভারি সুন্দর!' স্বামীজীর ভাষায়,—'শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন… অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সর্বব্যাপিত্বের এ কি রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য!'

বললুম, আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—'বাবা ত সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন?'

হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস…সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তা আবার বলবে কি!

একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলুম। কি আর করেন, সুন্দর সুঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত করে বললেন,—'বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই ত নেই। আমার জ্ঞান কখনও এই নশ্বর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয়নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, 'আমি সেই একই ছিলুম'। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও 'আমি সেই', নারীত্বে পৌঁছে তখনও 'আমি সেই'। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলুম—তাঁরা যখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইলে তখনও 'আমি সেই'। আর বাবা, এখন আপনার সামনেও 'আমি সেই'—একই আছি। আর এই অনন্তের কোলে আমায় ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্য-কালের জন্যে 'আমি সেই' একই থাকব!' এবারে আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। মূর্তি তাঁর মর্মর প্রতিমার মত নিথর নিস্পন্দ। মন কার ডাকে যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। গভীর কালো চোখ দুটি তাদের অতলস্পর্শিতা হারিয়ে প্রাণহীন নিষ্প্রভ—কাঁচের মত। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, তখন প্রায়ই তাঁদের এই

রকম ভাব বর্তমান থাকে। সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত। ঘণ্টাখানেক ধরে তুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলুম—আনন্দময়ী মা'র সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

সকল প্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পরিহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্তভাবে পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পণ্ডিত-দের চুলচেরা বিচারে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধ্রুব ন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মত সরল সাধিকা মানবজীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন—সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযুজ্যলাভ! লক্ষ কোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সবল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতিসকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে। অবশ্য এই সব মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টা-গুলিও সৎ,—কারণ তারা মানুষের মন সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় বটে কিন্তু যিশুখ্রীষ্ট তাঁর 'প্রথম আজ্ঞায়' যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকে তা আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য, তা তার একমাত্র দাতার মুক্তহস্তের দান—প্রথম শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

যোগানন্দ পরমহংস আবার বলছেন, রাঁচীতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শ্রীরামপুর স্টেশনে শিষ্যদের সঙ্গে গাড়ির জন্যে তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, বাবা, হিমালয়ে যাচ্ছি। অবশেষে গাড়িতে চড়লেন, ·· ···দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে, কি ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে কোন উপলক্ষ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর

থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি,……দেখুন, এখন—আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আমি চিরকাল সেই একই আছি।'

* * *

মানুষ বললে ভগবান নয়, আবার ভগবান বললে মানুষ নয়। যেমন বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি নয়। সবের মধ্যেই ভগবান এইটি জেনে সেবা করা চাই। এই জন্যই ভগবৎবুদ্ধিতে সেবা করা প্রয়োজন। ঈশ্বব বুদ্ধিতে তৎবুদ্ধিতে সেবা করলে ভগবানের সেবার ফল হয়। পশুপক্ষী বৃক্ষাদির সেবাও ভগবৎবুদ্ধিতে করলে ফল পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমা বলছেন ভক্তবৃন্দ-সমাবৃত হয়ে। হিমালয়ের পাদদেশে সোলনে। একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, ভগবান কি বস্তু? প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, কিছু নয়। ভগবান কোন বস্তু হলে তাঁর পেছনে লোক যাবে কেন? ভগবান পূর্ণ। এইজন্যই, পূর্ণের প্রকাশের জন্যই তাঁর কাছে আসা। ভগবানের অভাবের বোধেই তুনিয়ার তুঃখ। যেখানে ভগবানের প্রকাশ সেখানে তুই নাই। তুঃখের স্থান নাই। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চল---চেষ্টা কর। ঐ ত আসল পাগল। পাগল মানে—পাওয়া গেল—পেয়ে গেল। মানে অনন্ত প্রকাশ হওয়া। এই পাগলের জন্য পাগল হলে তুই-এর জন্য যে পাগলামি তা ছুটে যায়। কেউ পাগল কোনও শবীরের জন্য। ঐ পাগলামিতে-মোহ মায়ায় পড়ে নিজের শরীর নষ্ট করে দেয়। ভগবানের জন্য পাগল হলে শরীর নষ্ট হয় না। হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। যে শ্বাস পড়ছে সেটা যেন ব্যর্থ না যায়। ভগবান ত আপন। আপনাকে পাবার জন্য চেষ্টা করা চাই।

আবার বলছেন, ভগবানকে ছেড়ে তুমি কোথায়? তোমার পতি কারো পুত্র, আবার তোমার ছেলের পিতা তিনিই ত। তিন-

রূপে তিনি একই। যে ভাবেই দেখ, ধ্যান কর ইষ্টেরই ধ্যান হয়। যেভাবেই ডাক, ভগবানকেই ডাকা হয়। সব নামই ভগবানের, আবার অনামী অরূপ। যেরূপ যেভাবে নেবে তাই পাবে। ভগবানই যে ইষ্ট। কিন্তু মানুষ ভুল করে বিষয়কে ইষ্ট করে নেয়। ভগবান ছাড়া অপরকে ভাবা তাতে দু-ইষ্ট এসে গেল—'দুষ্ট'। বলে না দুষ্টবুদ্ধি এসে গেছে। কবে যাবে? নিজেকে তন্ন তন্ন করে বিচার করা দরকার। বিচার করে দেখবে আজ সারাদিন কি করেছি? ভগবৎ চিন্তন ছেড়ে কতক্ষণ ছিলাম? পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক, শুয়ে বা বসে কতটা ইষ্ট চিন্তা আর কতটা অনিষ্ট চিন্তা মানে, মৃত্যু। গতির মধ্যে ছিলাম এই মনে করা। মনুষ্য জন্ম যে দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্ম পেয়েও যদি ইষ্ট চিন্তায় সময় না দেও, তবে ভাবতে হবে, আমি কি করছি? আমার সারাটা জীবন কি এইভাবেই চলবে? যে কেউ এইভাবে চিন্তা করবে তারই মঙ্গল। না করলে মৃত্যুগতি। কারণ দেখ না দুনিয়ার স্বভাবই অভাব জাগরণ করে রাখা। যেমন অগ্নিতে যত বেশী কাঠ দেবে ততই বেশী প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এর অর্থ, সম্পদ যত বেশী পাবে অভাব ততই যাবে বেড়ে। যেমন দেখ না, যার দুনিয়ার বস্তুর কোন অভাব নেই তার শান্তি কোথায়? অর্থাভাব নেই, মোটর ঘরবাড়ি সবকিছুই মজুদ কিন্তু শান্তি নেই। কারণ কি? দুনিয়াতে দুনিয়ার বস্তু পেয়ে পরমশান্তি কখনও হতে পারে না। এই জন্যই চাই স্বভাবের জাগরণ। তুমি জ্ঞানস্বরূপ তুমি শান্তিস্বরূপ এই বোধ জাগ্রত করা। অভাবের মধ্যে তুমি যে থাকতেই পার না। অভাবে শান্তি নেই। নিত্য নূতন চাওয়া আসবেই। বিষয় যাতে বিষ হয় এতে ত পরমশান্তি নেই। যা আসা যাওয়ার মধ্যে তাতে শান্তি কোথায়? যতক্ষণ দুই ততক্ষণ দুঃখ। দুই হতেই যে দ্বন্দ্ব, দুঃখ। অভাব থেকেই দুঃখ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি লাভ হতে পারে না। নিত্য সত্য

যা তার প্রকাশের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা চাই। নিজের ঘরে যাবার চেষ্টা কর। পরের ঘরে অপরের সাথে সকলের দুঃখ দ্বন্দ্ব—মানে দুই নিয়া অন্ধ। অন্ধকার মানে অজ্ঞান।

সেইজন্যই বলা হয় অভ্যাস করবার জন্য চেষ্টা চাই। নিজের ঘরে যাওয়ার জন্যই চেষ্টা। তাঁর দিকে মন না গেলেই দুর্বুদ্ধি-দুর্গতি। দুর্ভোগ। মন সর্বদাই দুর্ভোগের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য দৌড়ায়। ভোগের ভিতর দিয়েই মানুষ আনন্দ খোঁজে। কিন্তু আনন্দলাভ ত ভোগ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না। যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ বিষয় ভোগ করে সে ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা ত সীমাবদ্ধ। সেইজন্য সুখও ক্ষণস্থায়ী। ভোগ্যবস্তুর মধ্যে আনন্দ খুঁজতে গিয়ে মনটাও অবশ হয়ে পড়ে। সেইজন্য বলা হয় নিরাসক্ত চিত্তে বিষয় ভোগ করবে। বিষয়ের মধ্যে থেকেও তখন বিশ্ব-বিধাতাকে আস্বাদন করতে পারবে। ভগবৎ মন্ত্র জপ ও ধ্যানে সর্বরোগ দূর হয়। চিত্তশুদ্ধি হয়।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, রুদ্রাক্ষমালা জপের আবশ্যকতা কি?

মা বলছেন, এক এক পূজায় যেমন এক এক রকম ফুল সেই-রকম মন্ত্রও পৃথক, মালাও পৃথক। মালা জপের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। তবে এক এক স্থানে আবার মালা জপ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত জপ করাই প্রয়োজন। জপ যখন হয়ে যায় আপনা হতেই, তখন আর সংখ্যা রাখার দরকার নাই। কিন্তু যতক্ষণ জপ করা হয় ততক্ষণ সংখ্যা রাখতেই হবে। কম করলেও একমালা রাখাই দরকার। জপ করা আর জপ হওয়াতে অনেক তফাত। ১০৮ মালা জপেরও বিশেষ কথা আছে। কে জানে কোন্ সময় ভগবৎ অনুভূতি হয়ে যায়। সংখ্যা জপ করেও আবার ভগবানকে অর্পণ করতে হয়। দুই বেলা তোমরা যেমন আহার কর তা ছাড়া অন্য সময়ও খেতে পার। সেইরকম জপও

নিয়মিত দুই তিন বার করতেই হবে। অন্য সময় যদি আরও করতে পারো তবে ত ভালই। মনের এরূপ অবস্থা আনা চাই যে ভগবৎ স্মরণ বিনা সকলই মুস্কিল।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন শ্রীশ্রীমা। একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপ করতেন। একদিন একজনের বাসায় অতিথি হন। যাঁর বাড়িতে ছিলেন তিনি গভীর রাত্রে শুনতে পেলেন কোথা থেকে যেন 'হরে কৃষ্ণ' নাম ভেসে আসছে। সজাগ হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। এবং বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর বাড়ি থেকেই এ শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কি করে সম্ভব? পাশের ঘরের জানলা খুলে আরও আশ্চর্যান্বিত হলেন এ গলার স্বর অতিথি ভদ্রলোকের। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কিন্তু কণ্ঠ হতে শ্বাসে শ্বাসে নিঃসৃত হচ্ছে 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপের আওয়াজ।

গল্পটি বলে মা মৃদু মৃদু হাসছেন আর বলছেন তাহলে দেখ অভ্যাসে কি না হয়। অভ্যাস ও যোগ। অভ্যাস যোগ বলে না!

কৃপা করলেই ত সবকিছু হয়। যাঁর নিকট কৃপার অখণ্ড ভাণ্ডার রয়েছে তিনি কৃপা করেন না কেন?

নিশ্চয়ই করেন। অনুভব নাই। সব সময়ই কৃপার বর্ষণ হচ্ছে। পাত্র সোজা রাখলে ভরে যাবে। পাত্র উল্টা ধরলে ত বয়েই যাবে। সব সময় তোমার পাওয়ার ইচ্ছা অভাব বোধ ত রয়েছে। সোজা কথা, তুমি সাধন করে যাও। বাকি তিনিই পূরণ করবেন। যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। অখণ্ড কৃপা হলে অখণ্ড প্রকাশ। যতটা করবে ততটাই ত পাবে। এক হয় কর আর পাও। এরও আগে গেলে দেখা যায় আমার কর্মের ফলে এই কৃপা আসে নাই।

আবরণ অপসারণ করার জন্যই কর্মের প্রয়োজন। তোমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন তাই দিয়েই তুমি কর্ম কর। তাঁর কৃপা যে অহৈতুকী। কেন কৃপা করছেন না এ তো তাঁর মৌজ। নিজেরই ত—যা ইচ্ছা

করেন। যখন হেতু থাকে তখন প্রাপ্তির ইচ্ছা আর ফল ভোগ। আমি করেছি তাই ফল ভোগ করছি। কিসের ফল? নিজের ক্রিয়া, নিজের ফল। ভগবান আপন, এক আত্মা। প্রথমে এই বোধ আসে না তাই প্রশ্ন উত্থাপন হয়। যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছ সেখান থেকে ঐরূপই দেখায়। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন,

—যে কোন লাইনে চল প্রথমে হাহাকার ব্যাকুলতা। পাওয়া যাচ্ছে না। এর পর কি যেন নাই। ভিতরে কি যেন পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয় ভোগ ভাল লাগে না। আবার এই খেয়াল রাখা কোন স্থিতিতেই যেন সন্তোষ এসে না পড়ে। কারো দর্শন, কারো কিছু অনুভব, কেউ বা আনন্দ অনুভব করে, সুখ বোধ হয়। মনে করে, নিজেই ভগবান হয়ে গেছে। যেমন গরীব তার খাওয়া জুটে না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করাতে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। খাওয়া জুটলো তো পড়ার নেই। তাও দেওয়া হলো। এর পর ঘরবাড়ি ছেলে মেয়ে সবই হলো। সব যখন হয়ে গেল তখন আবার সমস্যা বাড়িতে ভাড়াটে বসান হয়েছে কিন্তু ভাড়াটে ভাড়া দেয় না—এর জন্য আবার লড়াই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা। নালিশ। ভগবান, ভাড়াটে ভাড়া দেয় না। এই তো হলো সংসারের রূপ। সংসার মানে কি? সংশয়ের জায়গা। যে সংকে সাব মেনেছে, সে ত সং সেজে এসেছে। এই জন্যই বলা হয় সংসার। আবার আধ্যাত্মিক পথে পরম প্রকাশ হবার পূর্বে বিভূতির মধ্যে আটকিয়ে পড়ে। এর মধ্যে আটকিয়ে পড়াও বিঘ্ন।

ইষ্ট লক্ষ্য প্রাপ্তি চাই। সমস্ত প্রকাশ হতে ভগবানের বিভূতি। বিভূতিরূপে স্বয়ং। অদ্বৈত আত্মা—আবার দ্বৈতরূপে কে? ঐ ত।

রূপ বা যা কিছু বল, অনুভূতিতে অনুভবকারী থেকে যায়। অনুভবও একটা স্থান মাত্র। তাই তো বলা হয় অনুভবেরও উপরে চলো।

জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের আবরণ রয়ে গেছে, নিরাবরণ করবার চেষ্টা কর। সাধনা কর। জপ ধ্যান একটা কিছু কর। ভগবৎ চিন্তনের চেষ্টা করা আর কি। হরি চিন্তনেই মন বশ হয়। সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, জপ ধ্যান সব রকমের অভ্যাস করা। অভ্যাস যোগ বলে না! ভগবদ্‌ভাবে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হবার চেষ্টা করাই অভ্যাস যোগ। তৎসারূপ্য লাভ করবার চেষ্টা করা। যত্ন করা। সেই ভাবটি একধারায় প্রবাহিত করে রাখতে পারলেই তুমি দেখবে তুমি তদ্ভাবময় হয়ে গেছ। তুমি তখন নিজেকে সেই ভাবময় বলেই অনুভব করবে। এই হলো ভাবে অনুপ্রবেশ করা। ধ্যানের সাহায্যে ধ্যেয়ের সারূপ্যলাভ। অধ্যাত্মভূমিতে এইভাবে ভগবদ্‌ভাবে সারূপ্যলাভে অভ্যস্ত হলে অনুভবেরও উপরে চলে যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথামৃত পান করে উপস্থিত ভক্তবৃন্দরা মুগ্ধচিত্তে অনির্বচনীয় আনন্দসাগরে অবগাহন করতে লাগলেন। এইভাবে সকাল গেল, দুপুর গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। ভক্তপ্রবর বি. কে. শাহ এসে মায়ের কাছে বসলেন। মায়ের আনন্দঘন স্বর্গীয় মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তিশ্রদ্ধায় বিগলিত হলো প্রাণ। অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হয়ে বললেন,—'মা, আমি গরীব ছিলাম। ধন ঐশ্বর্য মান প্রতিষ্ঠা অনেক পেয়েছি। এখন শুধু প্রার্থনা তুমি আমার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকো। আমি পূজার ঘরে গেলেই চতুর্দিকে তোমাকেই দেখতে পাই। আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখ মা। তাহলেই আমার জীবন ধন্য হবে।'

মাও হেসে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তাঁর কৃপা ত সর্বদাই সকলের উপরই বর্ষিত হচ্ছে। তিনি যে দয়াময়। তাঁকে চিন্তা কর, তাঁকে ডাক। হরি চিন্তনেই মন বশ হয়, শান্ত হয়। সর্বাঙ্গীণ দর্শন হয়। সর্বাঙ্গীণ দর্শন ইষ্টের প্রকাশ। যেমন বলে না, 'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' প্রসন্নতায় ধন্য হলো ভক্তপ্রবর বি. কে. শাহ'র অন্তর।

ধীরে ধীরে উৎসব জেগে উঠলো মায়ের মন্দিরে। মা যেখানে বসে ছিলেন। জ্যান্ত মা'র মন্দিরে শত শত দীপের আলোকে, ধূপের সৌরভে আর পুষ্পের সমারোহে। সুমধুর স্বরে ধ্বনিত হলো মাতৃসঙ্গীত।

তোমারি তরে মা, পেয়েছি প্রাণ
তোমারেই প্রাণ সঁপিব,
তোমারি সাধন করিয়া সম্বল,
তোমারি চরণ পূজিব।

দশ

শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি হলেন শ্রীগুরুমর্যাদার তিথি। শ্রীগুরু অষ্টমী না হয়ে পূর্ণিমা হলেন কেন? পূর্ণিমার চাঁদে যেমন কোন কলার অভাব নেই। সম্পূর্ণ। তেমনি শ্রীগুরুস্বরূপে কোন বিফলতা নেই। কোন হানি নেই। ভগবানের করুণা জ্যোৎস্না শ্রীগুরু-স্বরূপে পূর্ণ রয়েছে। তাই শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি। শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি শ্রীব্যাসপূজার তিথি। এই তিথিতে সকল সম্প্রদায় গুরুপূজা করে থাকেন। ব্যাসপূজা করেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। অন্য কেউ করে না। ব্যাসদেবকে পূজা করা হয় কেন? ব্যাসদেব হলেন সকল সম্প্রদায়ের গুরু। ব্যাসদেব সনাতন ধর্মের মৌলিক আধার বেদের বিভাগ-কর্তা। বহু শাস্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা। দুর্বোধ্য উত্তর মীমাংসারূপী জটিল দর্শনের সারতত্ত্বকে তিনি সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন ব্রহ্মসূত্ররূপে। এই ব্রহ্মসূত্রই তাই ব্যাসসূত্র নামেও আখ্যাত। চারি সম্প্রদায—শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য এবং নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা করেছেন। তাই বেদব্যাস সকল সম্প্রদায়ের মূল গুরু।

সোলনে আষাঢ়ী পূর্ণিমার এই তিথিতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে ঘিরে সুরু হলো গুরুপূর্ণিমার উৎসব। মহাশুভ এই তিথিতে ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ আনন্দময়ী মা'র পূজায় ব্রতী হলেন। বিশেষ আগ্রহ যোগীভাইয়ের। কলকাতা থেকে ভক্তবৃন্দ এসেও মিলিত হয়েছেন। অখণ্ড কীর্তন সুরু হয়েছে। কলকাতা থেকে আনা রজনীগন্ধা, পদ্মফুল দিয়ে মাকে সাজানো হয়েছে। অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁর মুখশ্রী দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দৈবীভাবে বিভোর। যেন এক অখণ্ডরসে জমে আছেন। সেই

দিব্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠলো। পূজান্তে ভক্তপ্রবর নীরজ মুখোপাধ্যায় সকলকে দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে অঞ্জলি দেওয়ালেন। ভক্তিমতী কুমারী বীথিকা মুখোপাধ্যায়, কুমারী চিত্রা ঘোষ, বুলিদিও ছিলেন। সোলনবাসী ভক্ত স্ত্রী-পুরুষরাও এই মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। যোগীভাই মাকে অনুরোধ করে পূজার স্থানে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই আবার মাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। দশটার সময় পূজা সমাপ্ত হলো। সুরু হলো হোম। গীতা পাঠ। অপরদিকে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে রয়েছেন ভক্ত শিষ্যবৃন্দ। মা আর বিশ্রাম করলেন না। বেলা দুইটার সময় নিজেই চলে এলেন কীর্তনের স্থানে। ভক্তদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কীর্তন সুরু করে দিলেন। মা বলছেন, 'কি করা, ওরা কীর্তন করছে তাই শোয়ার ভাব নেই।' মায়ের মুখ হতে কৃষ্ণনামের ধ্বনি সুমধুর সুরে বের হতে লাগলো। ঢুলু ঢুলু ভাব আর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। ভক্তিশ্রদ্ধায় গলে গেল ভক্তবৃন্দের অন্তর। অনির্বচনীয় মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে নামগান করতে লাগলেন তাঁরা। কি সে সুর! কি সে ভাব!

এইভাবে দুপুর গেল, বিকেল গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। সুরু হলো সৎসঙ্গ। নানা ধর্মপ্রসঙ্গ, গুরু সম্বন্ধেও নানা আলোচনা। ভক্তরা প্রশ্ন করছেন আর মা উত্তর দিচ্ছেন। গুরু ও দীক্ষাদান প্রসঙ্গে মা বলছেন, নানারকমে গুরুকরণ হতে পারে। দৃষ্টি দ্বারা বাক্য দ্বারা স্পর্শ দ্বারা ইত্যাদি নানাভাবে। মহাপুরুষরা শক্তির প্লাবনেও সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আধার অনুসারে শক্তিলাভ হয়ে থাকে। গুরুর স্থিতি অনুসারে শিষ্যের অবস্থান হয়। তার উপরে যেতে পারে না। যেমন ভগবৎ কথা শোন, বক্তার যতটা শক্তি সেই

সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করে দেয়। এক হয় সৎ কথার ফল, আর যে বলে তাঁর শক্তি—এই দুই-ই পায়। গ্রহীতা তেমন শক্তিশালী হলে উপদেশমাত্র জ্ঞান হয়। উপদেশ দ্বারা দীক্ষা—যে উপদেশে নির্গ্রন্থি হয়ে যায়। মন্ত্র দীক্ষার যতটা শক্তি আছে ততটাই ত দিবে। শক্তিশালী হলে স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষের স্থানে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। অন্ততঃ যার যতটা শক্তি ততদূর নিয়ে যেতে পারে। গুরু যদি অগ্রসর না হয় শিষ্য তার আগে যেতে পারে না। শিষ্যকে এইজন্য রাস্তায় অপেক্ষাও করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরু অগ্রসর না হয়। আবার অনেক সময় শিষ্য গুরুর আগেও পৌঁছে যেতে পারে। পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী দীক্ষা নিয়ে নিজের অন্তর্শক্তি এত বেড়ে যায় যে গুরুর আগেও চলে যেতে পারে। দীক্ষা যে নিল তার শুধু এতটা পাওয়ার বাকী ছিল। যেখানে আমার গুরু জগদ্গুরু—জগদ্গুরু আমার গুরু। জগৎ মানে গতি, আর বদ্ধ মানে জীব। জগদ্গুরুর যে স্থিতি তার প্রকাশ। যেখানে 'আমি' কে তার প্রকাশের শক্তি যিনি দিতে পারেন তিনিই জগদ্গুরু। গাঢ় অন্ধকার হতে যিনি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারেন—তিনিই ত গুরু। তোমার গুরু হরেক রকমে প্রত্যেকের নিকট আছেন। আর প্রত্যেকের গুরু তোমারই গুরু। দেখ, গুরু তবে কিন্তু একই হলেন।

আবার মা বলছেন, দান সম্বন্ধেও কথা হলো যে, অপাত্রে দান হলে তার ফলভোগ হবেই। তবে নিষ্কাম ঈশ্বরবুদ্ধিতে দান করলে তার জন্য বন্ধন হয় না। পূজার উদ্দেশ্য কি? ইষ্ট প্রকাশ। আপনাকে পাওয়া আত্মপ্রকাশের জন্য। যাঁর পূজা করলে অদ্বৈত-দ্বৈতের প্রশ্ন আসে না তাঁরই পূজা করা। ভগবানের জন্য পূজা—নিষ্কাম পূজা। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ প্রশ্ন। যে লাইনে চলে সেই বিদ্যা এসেই যায়। যেমন পড়া—পাশ করা। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার জন্যও জ্ঞানদাতা ভগবানকে জানার চেষ্টা করা। জানবে

কি করে ? গুরুর সাহায্যে। গুরু কৃপায়। আবার উপদেশ নাই, ˆ নাই, স্পর্শ নাই, মন্ত্র নাই, কিন্তু শক্তিপাত হয়ে গেল। যেখান থেকে শক্তিপাত হয়, বন্যায় যেমন সমানভাবে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনই সব ভাসিয়ে দেয়। এখানে স্বভাব আপনার মধ্যে আপন করে নেওয়া। অপরের নিকট হতে দীক্ষা নিয়েছে, এই স্থান থেকে নেয়নি, এই কথা তখন আর টিকে না। তাঁরই ত সব। তিনিই সব। এই মহানশক্তি স্বাভাবিক রীতিতে আপনাকে আপনি করে নেয়। স্ব-স্ব-প্রকাশ-—স্ব-ই একমাত্র। কতটা শক্তিপাত করা হয়েছে তার ত আর লিস্টি করা হয় না কখনও।

যেমন দেখ, একজন এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। পরে তার এক মহাত্মার দর্শনলাভ হয়। তাঁকে ভাল লাগে। সেখানে যায়। গুরু একথা শুনে খুব চটে গেলেন। বললেন, 'আরে, আমি বাগান লাগালাম আর তুই অপরকে দিয়ে তা খাওয়াচ্ছিস ?'

শিষ্য প্রত্যুত্তরে বললো, ঐ মহাত্মার নিকট যাতায়াতে আমার গুরুর প্রতি নিষ্ঠা আরও বেড়ে গেছে।

কিন্তু গুরু তা বুঝলো না। তাই তো বলা হয় শিষ্যও অনেক সময় গুরুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। এবারে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সমাবৃত ভক্ত শিষ্যবৃন্দও মায়ের কথার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে।

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, প্রার্থনাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় কি না ? যাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় এই প্রার্থনা প্রকাশ হওয়া কঠিন। কারণ প্রারব্ধ ক্ষয় করা সব চাইতে কঠিন।—যার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে গেছে তারও প্রারব্ধ ভোগ করতে হবে কি ?

কেহ কেহ বলে যে জ্ঞানীরও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। যেমন পাখার সুইচ বন্ধ হয়ে গেলেও খানিকক্ষণ ঘোরে। ঐ পাখা চলাই প্রারব্ধ। আবার কারো মত যে জ্ঞানাগ্নি সব জ্বালাতে পারে আর ঐ প্রারব্ধ জ্বালাতে পারে না ?

জীবনের পরম পুরুষার্থ কি ?

—নিজেকে জানবার চেষ্টাই পরম পুরুষার্থ।

এবারে প্রশ্নকর্তা হাসতে হাসতে বললেন এত বড় প্রশ্নের এত ছোট উত্তর দিলেন মা ?

মাও হাসতে হাসতে বললেন, দেখ বাবা, অত বিরাট বট বৃক্ষ, তার বীজ কত বড় ? ঐটুকুর মধ্যেই ত সমস্ত বৃক্ষটি।

আবার একজন ভক্ত বলছেন, ভগবান আছেন কিনা ? আমি একজন মহাত্মাকে এই প্রশ্ন করায় তিনি একটি ডাণ্ডার বাড়ি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্যথা কোথায় ? এর অর্থ কি ?

ঠিকই ত, যেমন ঐ ব্যথার অনুভব হয়, তেমনি এই অনুভূতি স্বয়ংপ্রকাশ। যেমন ব্যথার অনুভব ভিতরে হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের অনুভূতিও হয়। ঐ ব্যথার অনুভবের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরের উপলব্ধিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাই তো বলা হয় যতদিন ভগবান লাভ না হয় ততদিন তাঁর খোঁজ বন্ধ না করা। মন দিয়ে জেনে, প্রাণ দিয়ে ভালবেসে, সংস্কার দিয়ে সংস্কারময় হয়ে তবে তাতে প্রবিষ্ট হতে হয়। চেতনা যখন এই ত্রিবিধভাবে কোন কিছুকে পায় তখনই সেই বস্তুকে যথার্থ পাওয়া হয়। ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল হয়। হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় না হলে কিছুই হয় না। চাই ধ্যান, চাই জপ, আর হরি-চিন্তন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথামৃত পান করে অমিয় সৌভাগ্যবান ভক্তদের হৃদয় অমৃতরসে পূর্ণ হলো।

হৃষীকেশ থেকে এসেছেন শ্রীগণেশ দত্ত গোস্বামীজী। মায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। কর্মযোগী পুরুষ। উত্তরকাশীতে থাকেন। আবার নানা তীর্থস্থান ঘুরেও বেড়ান। হৃষীকেশ সপ্তর্ষি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সেই সপ্তর্ষি আশ্রমে সংযম সপ্তাহ পালনের জন্য শ্রীশ্রীমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, —ভারতে তিন জন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব

হয়েছে ইদানীংকালে। দক্ষিণে মহর্ষি রমণ ও শ্রীঅরবিন্দ আর উত্তর ভারতে আনন্দময়ী মা। বাকী দুইজন গত হয়েছেন, এখন একমাত্র মাতাজীর উপরই সকল ভার। মাতাজীকে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছেন। আবাব বললেন, 'আমি ত ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করছি কুলি মজুর সাধারণ লোকের মধ্যে। আর মাতাজী ধর্মভাব প্রবাহিত করে দিচ্ছেন শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, রাজা মহারাজাদের মধ্যেও। যেখানে ইতিপূর্বে ধর্মের নামও কেউ কখনও করেনি।'

দিল্লী থেকে বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে এসেছেন পণ্ডিত নেহরুর সেক্রেটারী শ্রীউপাধ্যায়জী। সঙ্গে দুই কন্যাও আছেন। ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। মা ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে নানা গল্প ও স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। কমলা নেহরু যখন ডেরাছুনে মা'র কাছে আসতেন, উপাধ্যায়জীও তখন সঙ্গে আসতেন। সেই যুগের ছোটখাট নানা কথা। নানা কাহিনী। ঢাকা শাহবাগের নানা লীলাকাহিনী। সোলনে রাজা সাহেবের (যোগীভাই) সর্ব দিকে সুব্যবস্থার মধ্যে থেকে অসংখ্য ভক্ত এবার দীর্ঘসময় ধরে মাতৃসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করলেন। তাই তো সোলন পরিত্যাগের সময় এই নিরভিমানী একান্ত মাতৃগতপ্রাণ একনিষ্ঠ ভক্ত যোগী-ভাইয়ের কথা বার বার ভেসে আসতে লাগলো ভক্তদের মনে।

সত্যসত্যই একদিন সোলনের আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে শ্রীশ্রীমা আবার যাত্রা করলেন সম্মুখের পথে। মা ত কোথাও বেশীদিন স্থির হয়ে বসেন না। ট্রেনে সাহারাণপুর গিয়ে সেখান থেকে মোটরে সোজা কিষণপুর আশ্রমে পৌঁছালেন। ১৭ই জুলাই ১৯৫৫ সন। চতুর্দশীতে গেলেন হরিদ্বার। গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল। মা ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দসহ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলেন। হরিদ্বার থেকে এলেন দিল্লীতে। দিল্লীর কালকাজী আশ্রমে অবস্থান করলেন দু'দিন। মাতৃগতপ্রাণ যোগীভাই এলেন সোলন থেকে

মাতৃদর্শনে। এলেন দিল্লীর বিশিষ্ট ভক্তরা, ভক্তপ্রবর ডাঃ সন্তোষ সেন ও আরও অনেকে। সূর্যোদয় থেকে সুরু হলো অখণ্ড নামকীর্তন। 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নামরে।' প্রেমজলে ভাসালে স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা, প্রেমজলে ভাসালে। এমন মধুমাখা হরিনাম গৌর কোথা হতে এনেছে। এ নাম একবার শুনে আমার হৃদয়বীণ আপনি বেজে উঠেছে। কীর্তনানন্দে বিভোর হলেন ভক্তবৃন্দ। এইভাবে দিল্লীকে জাগিয়ে মাতিয়ে মা আবার চলে এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। জন্মাষ্টমীতে গেলেন গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়রের মহারাণীর একান্ত আগ্রহে। মহারাণী বিজয়ারাজে ভক্তিমতী রমণী। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ ভক্ত। গোয়ালিয়রের ভক্তদের মা নামগানে মাতিয়ে আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবন ধামে। সেখান থেকে এলাহাবাদে গোপাল ঠাকুরের আশ্রম হয়ে, এসে পৌঁছুলেন কাশীতে। সুরু হলো ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব। বৃন্দাবন থেকে পণ্ডিতপ্রবব শুক্রাচার্যজী এসেছেন এই ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। উৎসবের আলোকমালায় সজ্জিত আনন্দময়ী আশ্রমের প্রতিচ্ছায়া গঙ্গার তরঙ্গে আন্দোলিত হয়। গঙ্গার কলস্বরেও যেন অভিনন্দিত হয় ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব।

এগারো

ওহে বৃন্দাবন শ্যাম···ওহে অখিল পতি শ্যাম··· ।

সুস্বর কণ্ঠে গান করছেন আনন্দময়ী মা। দিল্লীর কালকাজী আশ্রমে। প্রভাতে। সঙ্গীত ধ্বনির মধুর তরঙ্গ মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়ে ভেসে চলে। চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলে। নীল আকাশের বুকে। সঙ্গীতে ঝরে পড়ে অতীত বৃন্দাবনের নানা স্মৃতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলামৃত। ব্রজপ্রেমদানের কর্তা, ব্রজলীলার নায়ক শ্যামসুন্দরের বিরহে কাতর শ্রীরাধারাণীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও হতাশার কথা। কত না বিদায় অশ্রু, কত না প্রাণস্পর্শী বংশী-ধ্বনির স্মৃতি। সেই প্রভাতী সঙ্গীতের সুরের দোলায় ভক্তদেরও দোলায়। সে সঙ্গীত ধ্বনি তাদের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাদের সকল স্বপ্নে জড়িয়ে যায় শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের যুগল বিলাস। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় তৃষ্ণার এক অপরূপ সঙ্গীতের আবরণে যেন তাদের আবৃত করে রাখে।

শ্রীশ্রীমা এখন শ্রীশ্রীহরিবাবাকে নিয়েই ব্যস্ত। তাঁকে সুস্থ করে তুলবার জন্যই মা দিল্লী আশ্রমে এসেছেন। হরিবাবাকেও ডাঃ সন্তোষ সেনের নার্সিং হোম থেকে কালকাজী আশ্রমে আনা হয়েছে। অনেকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। শ্রীশ্রীমা স্নেহময়ী জননীর মত তাঁর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে ভক্তপ্রবর ডাক্তার সন্তোষ সেনের চিকিৎসাধীনে রেখে চিকিৎসা করিয়েছেন। হরিবাবার জন্যই বিন্ধ্যাচল থেকে অমৃতসরে ছুটে গিয়েছিলেন, আবার কাশী থেকে ছুটে এসেছেন। হরিবাবার ভক্তশিষ্য পণ্ডিত সুন্দরলালজী বলছেন,—'সবই মা'র আশ্চর্য সুন্দর। মাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন হরিবাবার বিষয় ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। ঐ বিষয়

ছাড়া তাঁর যেন করবার বা বলবার কিছুই নেই। মায়ের সব কাজই যে অপূর্ব সুন্দর।'

অপারেশনের পূর্বে মা একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে হরিবাবা নার্সিংহোমে শুয়ে আছেন। মাও নিকটে রয়েছেন। আর হরিবাবার গুরুদেব স্বামী সচ্চিদানন্দজী যাঁকে মা কোনও দিন দেখেননি, তিনি হরিবাবার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হরিবাবাকে লক্ষ্য করে মাকে ইঙ্গিতে বলছেন, স্বয়ং রক্ষাকী জরুরত হ্যায়। আগামী-কাল ইহার সংরক্ষণ প্রয়োজন। মা হরিবাবার সঙ্গীয় ভক্তশিষ্যদের এই কথা জানিয়ে অখণ্ড নামকীর্তন, জপের ব্যবস্থা করেন।

হরিবাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে মা বিন্ধ্যাচল থেকে ছুটে গিয়েছিলেন অমৃতসরে। স্বামী পরমানন্দকে নিয়ে। সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসার কোন ভাল ব্যবস্থা না দেখে, হরিবাবাকে নিয়ে প্লেনে করে চলে আসেন দিল্লীতে। তারপর ডাক্তার সন্তোষ সেনের নার্সিংহোমে রেখে ডাঃ সেনকে দিয়ে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। হরিবাবা হাসপাতালে যাওয়া, এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করা বা অস্ত্রোপচার করার আদৌ পক্ষে নন। কিন্তু মা যে কিভাবে কখন কার জন্য কি ব্যবস্থা করেন তা সাধারণের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন। হরিবাবার এখন বাৎসল্যভাব। এমন এক ভাবপ্রবাহ হরিবাবার মনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে, মা ঠিক যেন তাঁরই স্নেহময়ী জননী। পুত্র কি মায়ের অবাধ্য হতে পারে ?

শ্রীশ্রীহরিবাবা সুস্থ হয়ে দিল্লী আশ্রম থেকে হোসিয়ারপুর যাওয়ার সময় বলেছিলেন নারায়ণ দাসজীকে, 'অপারেশনের পরে অজ্ঞান অবস্থায় দেখছি যে, ছোট্ট শিশুরূপে মায়ের কোলে শুয়ে মায়েরই স্তন পান করছি। শিশুর মত একটি নেংটিও পরা আছে। আর চারদিকে সাধু মহাত্মারা অনেকে জ্যোতির্ময় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এরূপ অপরূপ উজ্জ্বল জ্যোতি আর পূর্বে দেখি নাই।'

এই কথা শুনে গোপীনাথ কবিরাজ বলেছিলেন, 'মা যেমনভাবে হঠাৎ বিন্ধ্যাচল থেকে হরিবাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে অমৃতসর চলে গেলেন, সেও ত এক অদ্ভুত মাতৃভাব। সেইরূপ হরিবাবারও এই শিশুভাব মাতৃক্রোড়ে। ঠিক ঐ সময়টিতে মা গিয়ে অমৃতসরে উপস্থিত না হলে, সেখানে অপারেশন হয়ে কি বিভ্রাট হতো কে জানে! মা একেবারে ঠিক সময়ে গিয়ে উপস্থিত। এই ঘটনাও ত সাধারণ নয়।'

এইভাবে কৃপাময়ী মা আনন্দময়ীর কৃপা ত অবিরল ধারায় ঝরে পড়ছে। মা হরিবাবাকে উপলক্ষ করে দীর্ঘদিন দিল্লীতে অবস্থান করলেন। দিল্লীর ভক্তরাও মাকে কেন্দ্র করে মহামহোৎসবের আনন্দে বিভোর হয়ে রইলেন। সৎসঙ্গ, নামগান। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মাও গান করছেন। ভক্তদেবও মাতাচ্ছেন। ভক্তিমতী শোভাদি, গৌরীদি, গোপালের মা, স্বামী পরমানন্দ ও পানুদা মা'র সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মায়ের নানা সেবায় ব্যাপৃত ওঁরা।

'সত্য, ধৈর্য, শান্ত ও একত্বভাব অর্থাৎ সবই এক, এক ছাড়া দুই নাই। এই ভাবগুলি রাখার চেষ্টা করা।' জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করবার উপায় সম্বন্ধে মা বলছেন একজন বিদেশিনী মহিলা ও একজন সাহেবকে। আত্মানন্দজীর সঙ্গে তাঁরা এসেছেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। শুধু দর্শন করা নয়, প্রণাম করবেন ও শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করবেন।

'মনুষ্য জন্ম কেন? মানুষ কর্মপূরণের জন্যই জন্ম নেয়। আবার জন্মপূরণের জন্যও জন্ম নেয়। কিন্তু ভগবৎশক্তি যাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয় তিনি নিজের কর্ম নিজেও বদল করতে পারেন।

নিজেকে পাওয়ার যে রাস্তা, যা ছাড়া যায় না, তাই ত ধর্ম। আবার ভগবৎ প্রকাশের ক্রিয়াকেও ধর্ম বলা হয়। একমাত্র তিনিই ত। তিনিই ধরে আছেন। তিনি ছাড়া ত নাই। যা অক্রিয়া তাই হলো অধর্ম। ধর্ম ত একই। প্রত্যেকেরই প্রকাশিত

হবার পৃথক পৃথক রাস্তা আছে। যেখানে তুমি আছ সেইখান নিয়াই তুমি চল।'

নর-নারীর মধ্যে বড় কে?

দুই-ই বড়। শক্তি বিনা শিব কোথায়? রাধা বিনা কৃষ্ণ কোথায়? সীতা বিনা রাম কোথায়? শক্তি বিনা তুমিই বা কোথায়? যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই কেন থাকবেই।

মন্ত্র কি? যে অক্ষরে মনের ত্রাণ হয় তাই ত মন্ত্র। অক্ষর চিন্ময়—শব্দ ব্রহ্ম—নাম ব্রহ্ম। নামরূপে তাঁকে পাওয়া যায় এই ভাবনা রাখতেই হবে। আমার মধ্যে যে বীজ আছে তাতে বৃক্ষ হবেই এই বিশ্বাস রাখা।

আসল কথা, সহজ কথা, বিশ্বাস চাই। বালকের মত সরল বিশ্বাস। শুধু রঙিন স্বপ্ন নয়, দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধপরিকর বিশ্বাস। যা শূন্য দেখছি তা আসলে শূন্য নয়, পূর্ণেরই উদ্ঘাটন। ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাসে নিশ্বাসে এই শুধুই বিশ্বাস যে তিনি আছেন। একটা ছন্দ, একটা শক্তি, একটা নীতি। সেটা পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে না রেখে, নিয়ে আসা গভীর গোচরে। সরল বিশ্বাসে। তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ। সর্বত্র। দৈন্য শীর্ণ শুষ্ক শাখায়, বাতাসের ব্যাকুলতায়, বনশোভনা পুষ্পমঞ্জরীতে, কঠিন মলিন মৃত্তিকায়, তাপভঞ্জন তৃষ্ণার পানীয়তে। আমার অন্তরে অন্তরতম হয়ে, এই সরল বিশ্বাস রাখা। ধারাসিক্ত বাতাসে ফুলের সৌরভটি যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি জীবনের ব্যথার সমুদ্রে এই বিশ্বাসটিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

* * *

ভগবানের স্বভাবই তিনি সর্বদা কপাট খুলে রাখেন। যতটা সময় ও শক্তি দুনিয়ার কাজের জন্য দেওয়া হয়, ততটা যদি তাঁর জন্য দেওয়া হয় তবে নিজেকে চিনবার পথ আপনিই খুলে যায়। হয় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ নিয়ে থাক নয় নাম নিয়ে থাক। যতই এরূপ করবে,

ততই শুদ্ধ বুদ্ধি হবে। জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি পাবে। ভগবান যে প্রাণের প্রাণ। আত্মা। তাঁকে পাওয়া মানে নিজেকে পাওয়া। ছুনিয়া বলে তাকে, যা ছুর্বুদ্ধি ও ছুর্গতির দিকে নিয়ে যায়। ভগবানের থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হলো, আপনাকে জানা। আপনাকে পাওয়া।

মা বলছেন একজন ভক্তকে। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে। কাশীতে। কন্যাপীঠের মেয়েদের নূতন শিক্ষামন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে মা এসেছেন কাশীতে। এখানে মেয়েদের সংস্কৃত শিক্ষা দেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা পদ্মাজী। তিনি নূতন শিক্ষামন্দিরের আচার্যের পদ গ্রহণ করলেন। মা কাশীতে এসেছেন জেনে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের গুরুভাই শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এলেন বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে। ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন সমস্ত আশ্রমটি। বিশুদ্ধানন্দজীর পূর্ণাকৃতি শ্বেতপাথরের আসনে বসা মূর্তিটি দেখে মা বললেন, কেমন জীবন্ত মনে হয়। তিনি যেন এখনও রয়েছেন। নিত্য বিরাজ করছেন।

গুরুভ্রাতা বললেন, প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় মূর্তির মুখের ভাব পরিবর্তিত হতে দেখি। প্রথম যখন মূর্তি স্থাপিত করা হয় তখন হতে এখন মূর্তি যেন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়।

আশ্রমে নরমুণ্ডি আসনের পাশে মা কিছু সময় বসলেন। আসনের সারবস্তু নাকি স্বামীজী একটি কৌটায় পুরে মধ্যস্থ কুণ্ডের নীচে রক্ষা করে গেছেন।

ঘুরে ঘুরে সমস্ত আশ্রমটিই মা দেখতে লাগলেন। চারতলায় বিজ্ঞান মন্দির। স্বামীজী যে আসনে বসতেন, যে শয্যায় বসে উপদেশাদি দিতেন তা সবই মা ছুই হাতে স্পর্শ করলেন।

এইভাবে সমস্ত ছুপুর অতিক্রান্ত হলো। ধীরে ধীরে সূর্যদেবও অস্তাচলগামী হলেন। সূর্যাস্ত রেখার কোণে তখনও লোহিতাভা রয়ে গেছে। দিক্গুলের সে স্থানটুকু যেন বেশী উজ্জ্বল, বেশী নির্মল।

গোপীনাথ কবিরাজও এসে উপস্থিত হলেন। শুরু হলো সৎসঙ্গ। শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে শুরু হলো ধর্মালোচনা। মাও কঠিন তত্ত্বকে সহজ করে সরল ভাষায় বলতে লাগলেন। নানা প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগলেন প্রশ্নকর্তার ভাবটিকে নষ্ট না করে।

একজন প্রশ্ন করলেন এই দুনিয়ার প্রতি প্রেম কম হয়ে ভগবানের প্রতি প্রেম কিসে বাড়ে? হেসে হেসে মা বললেন, 'পার্থিব প্রেম বড় কষ্টদায়ক ও নাশবান। আর ভগবৎ প্রেম বড়ই সুখদায়ক। তাই তো ভগবৎ স্মরণে যত বেশী সময় দেওয়া যাবে ততই ভগবানের প্রতি ভালবাসা বেড়ে যাবে। গুরু যে নাম দিয়েছেন সেই নাম জপ করা। ধ্যান করা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা, কীর্তন করা। এই সব কর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে অর্থাৎ নিয়মিত-ভাবে করে গেলে, ভগবানের প্রতি প্রেম বাড়ে। তাতে মন শান্ত হয়। শান্তি পাওয়া যায়।'

গোপীনাথ কবিরাজ শোনালেন ওঁর গুরু বিশুদ্ধানন্দজীর এক অলৌকিক ঘটনার কাহিনী।

আশ্রমে নরমুণ্ডির আসন স্থাপিত হবাব পর একখানি নূতন চাদরের প্রয়োজন হলো। গোপীনাথ কবিরাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ চারখানি চাদর কিনবার সঙ্কল্প করলেন। সেই অনুসারে কবিরাজ মহাশয় আশি টাকা নিয়ে এলেন। এবং গুরু বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে চারখানি চাদর কিনবার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিশুদ্ধানন্দজী বললেন, এত খরচের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র একটি চাদরের জন্য ২০৲ টাকা খরচ করলেই হবে। কিন্তু কবিরাজ মশায় অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে রাজী হলেন না। স্বামীজী বললেন, বেশ, তাহলে অবশিষ্ট টাকা আশ্রমে দেওয়া হোক। তখন কবিরাজ মহাশয় স্বামীজীর হাতে টাকা দিতে উদ্যত হলেন, স্বামীজী বাধা দিয়ে বললেন, টাকা তোমার হাতেই থাক, ওখান থেকেই চলে যাবে।

কবিরাজ মহাশয় ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কি করে তা সম্ভব হবে ?

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী মৃদু হেসে বললেন, টাকাটা হাতে নিয়ে বস। কোন চিন্তা করো না।

কবিরাজ মহাশয় গুরুর নির্দেশমত টাকাটা হাতে মুঠো করে চোখ বুজে বসে রইলেন। টাকাটি একটি খামের মধ্যে ছিল। কিছুক্ষণ পর স্বামীজী চেয়ারের গায় টোকা দিয়ে দুটি শব্দ করলেন এবং আস্তে আস্তে বললেন, আসিয়াছি। পরমুহূর্তেই কবিরাজ মহাশয়কে বললেন, 'মুঠা খোল। নিয়ে গেছে।' কবিরাজ মহাশয় মুঠো খুলে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন। খামটি ঠিকই আছে। কিন্তু তার ভিতর টাকা নেই। এবং সেই খামটি থেকে এক অপূর্ব দিব্যগন্ধ বেব হচ্ছে। সেই দিব্যগন্ধ ঐ খামে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এইভাবে নানা বিভূতিলীলা দেখাতেন ভক্ত-শিষ্যদের। আর রহস্য করে বলতেন, যদি তত্ত্বালোচনা শুনতে চাও তবে গোপীনাথের কাছে যাও। আর যদি কিছু প্রত্যক্ষ করতে চাও তবে আমার কাছে এস।

আবার বিভূতিলীলা দেখতে চাইলেই স্বামীজী কুমারী পূজা করতে বলতেন। একসঙ্গে পঞ্চাশ, একশত কুমারীর আয়োজন করা হতো। এব কারণ সম্বন্ধে ভক্তরা প্রশ্ন করলে বলতেন, এসব দেখালে যে আমার অপরাধ হয় বাবা! আর এই অপরাধ খণ্ডনের জন্যই কুমারী পূজা করা। বিশুদ্ধানন্দের দেহ থেকে পদ্মগন্ধ নির্গত হ'তো তাই জনসাধারণের কাছে তিনি 'গন্ধবাবা' বলে পরিচিত ছিলেন।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী যখন জীবদেহে বর্তমান ছিলেন তখন একবার তাঁর সামনেই শিষ্যপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজকে উদ্দেশ্য করে আনন্দময়ী মা বলেছিলেন, 'বাবাজী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। তোমরা এসব দেখে ভুলে থেকো

না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বস্তু আছে তা শীগ্‌গির তোমরা আদায় করে নাও।'

স্বামীজীর সুকণ্ঠস্বর ভক্তি আর সুরকুশলতা ছিল অপূর্ব। সেতার ও পাখোয়াজ সুন্দর বাজাতেন। 'গীত রত্নাবলী' নামে একখানি সঙ্গীত গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলতেন, 'সব রসই ত এক মূল হতে আসে। রস শুদ্ধ করে নিলে তা দ্বারাই যাওয়া যায় রসস্বরূপের কাছে।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের অপার কৃপা বর্ষিত হয়েছিল ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজের উপর। ওঁর ভবিষ্যৎ জীবনধারার উপর অনেকখানি প্রভাব ছিল বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের। বিশুদ্ধানন্দ আশ্রমেই মায়ের ভোগ হলো। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো কাশীর বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম।

হঠাৎ মা আবার মোটরে করে চলে গেলেন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। একদিনের জন্য। সেখানে কথা হলো একজন ভক্তমতী মহিলার সঙ্গে। মা বলছেন, দেখ, জোর করে কখনো কিছু বলা, কি করবো আর কি করবো না, ঠিক নয়। কারণ এর ফল অনেক সময় বিপরীত হয়। যে যা করবে না জোর করে বলায় তাই তার জীবনে ঘটে যায়। এবং তার ফলস্বরূপ জীবনে আসে নানা লাঞ্ছনা ও অপবাদ। যা হয়তো তার জীবনে আসার কোন কারণই ছিল না। সঙ্কল্প বিকল্প ঠিক নয়, বিধির বিধান যে অমোঘ। এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

এক যুবক বিয়ের রাত্রেই, 'সংসার করবো না' বলে, স্ত্রীকে ত্যাগ করে বের হয়ে পড়লো। পরমতম আনন্দের সন্ধানে। এক মহাত্মার নিকট থেকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাও নিল। গুরুসেবার মধ্য দিয়ে দিন অতিক্রান্ত হতে লাগলো। গুরুদেব লোকালয়ে ভক্ত-শিষ্যবাড়িতেও যাতায়াত করে থাকেন। সঙ্গে নবীন শিষ্যটিও থাকে। এদিকে নব-পরিণীতা মেয়েটির মনেও শান্তি নেই। বিয়ের

পরই স্বামীকে হারালো একি কম দুঃখ! শান্তির অন্বেষণে সাধু সন্ন্যাসীর কাছে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। ঘটনাচক্রে একদিন তার স্বামীর গুরুদেবের কাছেই এসে উপস্থিত হলো। তাঁকে প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করে বললেন, 'পুত্রবতী হও।'

মেয়েটি এবারে কেঁদে ফেললো।

সন্ন্যাসীপ্রবর কিছুই বুঝতে পারলেন না। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা কাঁদছো কেন?

মেয়েটি এবার ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, বাবা, আমার স্বামী ত সন্ন্যাসী। ঐ ত বসে রয়েছেন।

গুরুদেব এবারে সবকিছুই বুঝলেন। আরও হৃদয়ঙ্গম করলেন ওঁর আশীর্বাদই বৃথা হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি সন্ন্যাসী শিষ্যকে আদেশ করলেন গার্হস্থ্য-আশ্রম প্রতিপালন করতে। মেয়েটিও আনন্দিতচিত্তে তার স্বামীকে নিয়ে ঘরে ফিরলো। ক্রমে ক্রমে তাদের চারটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো। কিন্তু লোকনিন্দায় সংসারজীবনেও সুখী হতে পারলো না। জমিয়ে সংসার করা আর হলো না। সন্ন্যাসীর আবার ছেলেপুলে হয়? প্রতিবেশীদের এইসব বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা, নিন্দা অপবাদ চরমে উঠলো। অবশেষে স্বামী স্ত্রী গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করলো। শেষ পর্যন্ত যুবকটির সেই 'সংসার করবো না' ঐ কথাই সত্য হয়ে রইলো। বিধির বিধান এই ভাবেও ত ফলে। তাই ত বলা হয় জোর করে কখনও কিছু বলা ঠিক নয়। যেটা হয়ে যায়—সেটাই ঠিক। আপনা হতে যেটা এসে পড়ে। যদি হওয়ার হয়, সময়ে হইবেই। ভালমন্দ সব তাঁরই চরণে,—এই ভাবটা বিশেষ করে নেওয়া। সবটার মধ্যেই তাঁকে রাখা। কর্ম করে যাওয়া। কর্ম-ফল তাঁরই চরণে অর্পণ করবার চেষ্টা করা। সব কাজের মধ্যেই তাঁর নাম রাখা। দিন ত চলেই যাচ্ছে।

এইভাবে বিন্ধ্যাচল কাশীর লীলা সাঙ্গ করে মা আবার চলে

এলেন বৃন্দাবন ধামে। বৃন্দাবন আনন্দময়ী আশ্রমে পঞ্চশিব প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে। শিবলিঙ্গগুলির নাম রাখা হয়েছে, সিদ্ধেশ্বর, বানেশ্বর, নর্মদেশ্বর, গোপেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে বৃন্দাবন আশ্রম। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তরা এসেছেন। বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। এই মন্দির স্থাপিত হওয়ায় আশ্রমও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বামে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের বিশাল শ্বেতমন্দির আর দক্ষিণে একই আকারের পঞ্চশিব মন্দির। মধ্যে জগমোহন। সম্মুখে সুবৃহৎ ভাগবৎ ভবন।

যখন মন্দিরে আরতির দীপ জ্বলে ওঠে তখন শুক্লপক্ষের সান্ধ্য-চাঁদ মন্দিরে মন্দিরে আলো ছড়ায়। জ্যোৎস্নার রাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের আনন্দময়ী আশ্রম আলোছায়ার মধ্য দিয়ে অপূর্ব এক শ্রী ধারণ করে। আনন্দময়ী মা'র হাসির ছায়া পড়ে মন্দিবে মন্দিরে, দীপ্ত হয়ে ওঠে বিগ্রহ, আর টলমল করে যমুনার জল—যেন বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধারাণী দোলা দিয়েছেন জলে।

প্রহরে প্রহরে পূজার ব্যবস্থা হলো। জগমোহন মন্দিরেও পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সকলে পূজা করবে স্থির হলো। প্রথম প্রহরে যোগেনদা, দ্বিতীয় প্রহরে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরে পূজা করলেন কুসুম ব্রহ্মচারী। প্রতি প্রহরে পূজার পরই সুরু হয় কীর্তন। শ্রীশ্রীমাও সারারাত্রি জাগলেন। নামকীর্তন করলেন। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে। ভক্তদের প্রাণেও জেগে উঠলো অপরূপ অনির্বচনীয় এক ভাবময়তা। মায়ের এই ভাবাবেশ ও ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মা বলেন, 'আমার লক্ষ্য কোথাও আবদ্ধ নেই। এর কোন প্রয়োজনও নেই। তোরা ভাবাবেশের লক্ষণ দেখতে চাস, তাই এ শরীরে কখনও কখনও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।'

অপূর্ব সুন্দরভাবেই আনন্দময়ী মাকে ঘিরে শিবরাত্রির উৎসব বৃন্দাবন আনন্দময়ী আশ্রমের শিবমন্দিরে অতিবাহিত হলো।

ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করতেও মা দ্বিধা করেন না। ভক্তিমতী মহিলা ভবানীদি মা'র কাছে একটি শিবলিঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন। কান্তিভাই নর্মদা থেকে এনেছেন কয়েকটি শিবলিঙ্গ। তার মধ্যে একটি শিব দেখে ভবানীদির মন ব্যাকুল হলো সেটি পাওয়ার জন্য। মাও ভক্তের ব্যাকুলতা দেখে প্রীতমনেই সেই শিবলিঙ্গটি ভবানীদিকে দিয়ে দিতে অনুমতি দিলেন। সেটি হলো গঙ্গেশ্বর। ভবানীদিও অভিভূত হয়ে আনন্দিতচিত্তে মাকে প্রণাম করলেন। এই ভবানীদি ভক্তপ্রবর ৺নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। এর স্বামী শ্রীযুত রণজিৎকুমার ব্যানার্জি, অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র। মা-অন্ত প্রাণ। ভক্তমানুষ। বিশিষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। কিন্তু নামগানে পাগল। কোথাও কীর্তনের আসর হলেই উপস্থিত হন। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে নিজেও মাতেন, অপরকেও মাতান। কলকাতা-আগরপাড়া আনন্দময়ী মা'র আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্বভারও তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন। রসিকভক্ত মানুষ রণজিৎ ব্যানার্জি শ্রীশ্রীমায়েরও স্নেহধন্য। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আনন্দময়ী মা'র ভক্ত ও শিষ্য। আর ঐ গঙ্গেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা হয় ডেরাডুনের কল্যাণবনের শিবমন্দিরে। সেও এক বিচিত্র অলৌকিক ইতিহাস।

* * *

জয় শচীনন্দন নদীয়া বিহারী,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন জয় গৌর হরি।

* * *

জয় অদ্বৈত নিত্যানন্দ জয় শ্রীগৌরাঙ্গ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।

তারপর আবার সুরু হলো 'হরিবোল' 'হরিবোল' নামতরঙ্গ। মা সুমিষ্টকণ্ঠে গাইছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদেরও সেই নামতরঙ্গে তরঙ্গায়িত করে তুলছেন। মা-নামের দোলায় দুলছেন। ভক্তরাও

ছলে ছলে নেচে নেচে কীর্তন করছেন। শ্রীবৃন্দাবনে। দোলপূর্ণিমার উৎসবে। শ্রীশ্রীহরিবাবা ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীও আছেন।

মহাপ্রভুর মন্দিরের চারিদিক ঘুরে ঘুরে নামকীর্তন চলতে লাগলো। এই অধিক বয়সেও মায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলকেই মুগ্ধ করলো। ছেলেমেয়ের দল সকলেই মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কীর্তন করতে লাগলো। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্। কৃষ্ণ নামের মধুর তরঙ্গ বয়ে চললো আশ্রমের বায়ুমণ্ডলে, শ্রীধাম বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীব লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আজ আবার শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাও লীলা করছেন। রাধাকৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে আজ আবার নূতন করে যেন প্রবাহিত করে দিলেন গোপীভাবামৃত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এ যেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজের রস-আস্বাদন করতেই আবার আবির্ভূত হয়েছেন। সেই মধুর ব্রজের নির্মল রাগ শ্রবণ করে যেন ভাব-বিহ্বল হলেন মা। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

শ্যামসুন্দরকে দর্শনমাত্রেই শ্রীরাধারাণীর হৃদয় উছলিয়া উঠলো। তিনি আড়-নয়নে তাঁকে দর্শন করতে লাগলেন। কিন্তু লোকের ভয়ে প্রেমের বিকার চেপে রেখে, মুখের উপর আড়ঘোমটা টেনে দিলেন। সেই গ্রীবার ভঙ্গী এবং নবনীকোমল শ্রীহস্তের শোভা দর্শন করে শ্যামসুন্দরও মোহিত হলেন। শ্রীরাধাও নানা ছল অবলম্বনে, মাঝে মাঝে অবগুণ্ঠন মোচন করে শ্যামসুন্দরের মুখের পানে তাকাতে লাগলেন। শ্যামসুন্দর ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধার সেই মুখচন্দ্রমা দর্শন করে বিমোহিত হলেন। চঞ্চল হলো দেহ মন প্রাণ। বার বার শ্রীরাধার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। পূর্ণচন্দ্র দর্শন করে যেমন চকোর নেচে ওঠে, নবঘন দর্শনে যেমন চাতক বিহ্বল হয়, চন্দ্র উদয়ে যেমন সাগর উছলিত হয় রাধারাণীকে দর্শন করে শ্যামসুন্দরের হৃদয়ও আজ তেমনি উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। রাধারাণীও আত্মবিস্মৃত। এই প্রকারে অচিন্ত্যভাবে রাধাশ্যামের

মধুর মিলন হলো। আবার নিশীথে হয় কুঞ্জ-বিলাস। সখীগণসহ শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধাসহ শ্রীশ্যামসুন্দর নিরবচ্ছিন্নভাবে মিলিত হলেন। উভয়ের মিলন যোগমায়া সংঘটন করেন। সখীগণ যুগলমিলনে নানাভাবে সাহায্য করলেন। সেই যুগলকিশোরের লীলাবিলাস ভাবচোখে আনন্দময়ী মাও যেন দর্শন করলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যুগলকিশোরের বৃন্দাবন লীলা দর্শন করে বিমোহিত হলেন। তখন দৈবীভাবের স্বতঃস্ফূর্ত লক্ষণাদি তাঁর দেহসীমার মধ্যে সীমাতীতের অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠলো। সর্বজগৎব্যাপী যিনি তিনিই ত এই শ্যামসুন্দরের বিলাস। তিনিই তনুরূপ ব্রহ্ম। তনু ও ব্রহ্মরূপ তিনিই। জীবমাত্রের প্রেমময় তৃষ্ণাও নিত্যসিদ্ধ। একমাত্র প্রেমময় তৃষ্ণা সহকারে শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলনই নর-তনুর উদ্দেশ্য। আনন্দময়ী মাও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের জন্যই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মা'র তখন গোপীভাব। মা'র দেহ নিত্যসিদ্ধ গোপীদেহ। সুস্বর কণ্ঠে মা তাই গেয়ে উঠলেন, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্··· ··।

বারো

গঙ্গার কলস্বর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দীপ জ্বলে কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে। আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে ওঠে আশ্রম প্রাঙ্গণ, বিশাল প্যাণ্ডেল। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে সমগ্র আশ্রম। ভক্তবৃন্দের চিত্তও উৎসুক হয়ে ওঠে। সম্মিলিত হয় এসে আশ্রম প্রাঙ্গণে, প্যাণ্ডেলে। আনন্দময়ী মা'র ষষ্ঠীতম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। উৎসবের আলোকমালায় সজ্জিত আনন্দময়ী আশ্রমের প্রতিচ্ছায়া গঙ্গার তরঙ্গে আন্দোলিত হয়।

বিরাট উৎসব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মারা আসছেন। বিশেষ অনুষ্ঠানাদির ভিতর রয়েছে সহস্র চণ্ডীপাঠ, রুদ্রাভিসেক, মহামৃত্যুঞ্জয় জপ, বিষ্ণু যজ্ঞ, শিবার্চনা, তুলাদান, কুমারী পূজা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, পণ্ডিত বিদায়, সমস্যা-পূর্তি ও সাধু সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে নিত্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থা। এত বড় বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান ও উৎসব সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পর কাশীর আশ্রমে আর হয়নি। মায়ের জন্য অষ্টধাতু নির্মিত সুবৃহৎ সিংহাসনও নির্মিত হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী এক সময়ে ভাবচোখে আনন্দময়ী মাকে সিংহবাহিনী মূর্তিতে নয়নগোচর করেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর ইচ্ছা জেগেছিল মনে জীবন্ত আকারের একটি সিংহ নির্মাণ করে তার উপর মায়ের আসন স্থাপন করবেন। সেই ইচ্ছা তাঁর আজ পূর্ণ হলো, শ্রীশ্রীমায়েরই কৃপায়।

কাশীর প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ভক্তবৃন্দ এসে একত্রিত হয়েছেন। রাজা মহারাজা, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু শিখ খৃষ্টান ইহুদি, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, বিশিষ্ট সাধারণ, বালক

বৃদ্ধ নারী সকল শ্রেণীরই ভক্ত মানুষ আর সাধু সন্ন্যাসীর দল ধীরে ধীরে এসে মিলিত হচ্ছেন। সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট ভক্তমণ্ডলীর। সর্বপ্রথমে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীশ্রীহরিবাবা ভক্তবৃন্দসহ। বৃন্দাবনের বিখ্যাত রাসলীলা পার্টিও এসেছে। বম্বে থেকে কৃষ্ণানন্দজী, বৃন্দাবন থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূত, চক্রপাণিজী, ঝুঁসি থেকে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী, কলকাতা থেকে শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশরণানন্দজী, আরও অন্যান্য স্থান থেকে বহু মহাত্মারা এসে উপস্থিত হলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ত আছেনই। কলকাতার ভক্তপ্রবর শ্রীশশধর ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী অরুণাদিও এসেছেন। এঁরা স্বনামধন্য মহেশ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এঁদের সমস্ত পরিবারটিই মায়ের ভক্ত। মা-অন্ত প্রাণ। অরুণাদি ও শশধরদা শ্রীশ্রীমায়েব বিশেষ স্নেহধন্য এবং কৃপাপ্রাপ্ত। ভক্তপ্রবর প্রচ্ছন্ন যোগী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—আনন্দময়ী মা'র স্নেহধন্য চিত্তও এসেছেন। টিহরীর মহারাজা, মহারাণী, সোলনের রাজাসাহেব (যোগীভাই), অধ্যাপক শ্রীযুত ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, গায়িকা ভক্তিমতী বমণী শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তগায়ক সুখেন্দু গোস্বামী, ওঙ্কারনাথজী, রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, কণ্ঠে মহারাজ, শান্তা-প্রসাদ প্রভৃতি বহু ভক্ত শিল্পীবৃন্দেরও সমাবেশ হয়েছে। শান্তি-নিকেতন থেকে এসেছেন সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত শৈলজা মজুমদার ছাত্রছাত্রীবৃন্দসহ। ভক্তপ্রবর বি. কে. শাহর স্ত্রী চিত্র-শিল্পী শ্রীমতী লীলাবেনও এসেছেন। তিনি সুবৃহৎ প্যাণ্ডেলটি সাজাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং দিবারাত্র পরিশ্রম করে প্যাণ্ডেলটিকে সুসজ্জিত করে তুলেছেন। শুধু কাশীধাম নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের ইতিহাসে এত সুন্দর অভিনব ও সুবিশাল প্যাণ্ডেল ইতিপূর্বে আর কোথাও নির্মিত হয়নি। এত গুণী শিল্পীবৃন্দের সমাবেশও কাশীতে আর দেখা যায়নি। দেখে মনে হয় যেন

সঙ্গীতের মহাযজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমে। আর সেই সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত, নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনন্দময়ী মাকেই যেন শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দরা।

সুবিশাল অতিকায় মেঘচুম্বী শৃঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অচল অটল হিমালয় পর্বত, তাকে ঘিরে আর্তনাদ করে চলেছে প্রমত্ত ঝড়, ব্যর্থ আক্রোশের ঝড়, বেদনার ঝড়। কি বিপুল বেদনা! কিন্তু পর্বত অচঞ্চল, ধীর শক্তিমান। আসুক ঝড়·· বেদনার ঝড়···নানা ঝঞ্ঝা··· সহ্য করবার ক্ষমতা আছে তার। আনন্দময়ী মাও সেই হিমালয়ের মতই প্রশান্ত নিস্তব্ধতায় বিরাজিতা। শক্তিময়ী, ধীর, অচঞ্চল। শুধু মানুষ নয়, প্রতিটি জীবের এমন কি বৃক্ষরাজিরও অন্তরের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করছেন,···সঙ্গীতস্রষ্টার অনুরাগমত্ত আর্তস্পন্দন···গৃহস্থ মানুষের দুঃখ বেদনার দুরন্ত ঝড়ের ঝাপটা তাঁর মুখে চোখে এসে যেন সজোরে লাগছে। কিন্তু তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে বিরাট সত্তার সংস্পর্শে এসে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভেঙেচুরে নিমেষের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড কলরবও তাঁর বুকে এসে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রশান্ত নিস্তব্ধতায়। মা যে স্বয়ং স্বপ্রকাশ, চিরব্যক্ত, চিরজ্যোতির্ময়ী, বেদময়ী। যে বেদনের অভিব্যঞ্জনার জন্য তিনি বিশ্বরূপে ব্যক্ত, সেই বেদন ত তিনিই! বিশ্বের অণুতে অণুতে ঝঙ্কৃত কি?

ঋক্, সাম, যজুঃ। এই ভুবনের ভূতে ভূতে কোন্ বেদনের শিহরণ? ঋক্, সাম, যজুঃ। ভবার্ণবের সুনীল বুকে কিসের বেদন লহরিত? ঋক্, সাম, যজুঃ। চিদ্‌গগনে তড়িৎলহরে ফুটে উঠেছে নর্তক, ভীমরুদ্র, শান্তশীতল, তীব্রমধুর, কত ব্যথার বিপ্লাবন স্পন্দিত, ধ্বনিত, অভিরঞ্জিত, স্তব্ধ···জীবন মরণের ভৈরব ভীম ভবোল্লাস—এসব কি? বেদন। কিসের বেদন? অপৌরুষেয় আকাশবাণীর বিঘোষণ, ভগবানের বুকের ব্যথায় মূর্ত রূপ···ঋক্

সাম যজুঃ। পরমাত্মার পরাশক্তি ঋতছন্দা, ঋতপ্রজ্ঞা, ঋতবেদা ঋক্। ভাবময় প্রাণময় সংগীতিময় সাম। কর্মময় ভোগময় যজ্ঞময় যজুঃ। এই ত্রিমূর্তিতে পরমাত্মার জ্ঞানমূর্তি প্রকাশই বেদন। বেদন একদিকে জগৎমূর্তিকে ধারণ করে, অন্যদিকে পরমতত্ত্বকে অনুভূতি-রূপে উপলব্ধ করায়। ইহা ত্রিধা।—ঋক্ সাম যজুঃ। জীবের তিন গ্রন্থি—মন হৃদয় সংস্কার আর এই ঋক্ সাম যজুঃ একধর্মী। একশক্তি। জীবত্বে গ্রন্থি আর পরমেশ্বরে শক্তি—মন্ত্রশক্তি। জীবের আত্মায় প্রাণে মনে ইন্দ্রিয়ে যা কিছু প্রকাশ পায়, সমস্ত বেদন। সাধারণ জীবে সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তা গ্রন্থি। আর পরমেশ্বরে যা প্রকাশ পায় তাই ত্রয়ীবিদ্যারূপ বেদ। বেদনই এইভাবে সত্যানৃত্যরূপে ঝঙ্কৃত। যিনি বেদজনক ও ওঙ্কাররূপ অক্ষর ব্রহ্ম তিনিই আবার জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করছেন। যিনি বিশ্বজননী তিনিই আনন্দময়ী—তিনিই বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। ঋকময় সামময় যজুর্ময়—বাক্প্রাণমনোময়। তেজোময়ী মন্ত্রময়ী বীজময়ী—প্রাণময়ী আনন্দময়ী মা।

২রা মে ১৯৫৬।

সকাল থেকেই সুরু হলো চণ্ডীপাঠ। সুললিত কণ্ঠে।

বাঙালী, হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি পঁচিশ জন পাঠক পাঠ আরম্ভ করলেন। আচার্য অগ্নিহোত্রী বাটুদা। জাপক বিশু পুরোহিত এবং যজমান টিহরীর মহারাজা। রাজকীয়ভাবেই অনুষ্ঠান সুরু হলো। বেদীর উপর সুসজ্জিত ঘট স্থাপন করে তার উপর রৌপ্য সিংহাসনে চণ্ডীদেবীর স্বর্ণমূর্তি স্থাপনা করা হয়। দেবীমূর্তি নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত করা হলো। এইভাবে সহস্র চণ্ডীপাঠ ত যথারীতি অতি সুন্দরভাবেই সুসম্পন্ন হতে চললো। কিন্তু টিহরীর মহারাণীর ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি মাঝে কাশীতে ছিলেন না। হঠাৎ এসে যখন শুনলেন সাধারণভাবেই চণ্ডীপাঠ

হচ্ছে, তখন তাঁর মনের ইচ্ছা জানালেন শ্রীশ্রীমাকে। অবশেষে ভক্ত মহারাণীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আবার নূতন করে শুরু হলো সহস্র চণ্ডীপাঠ। সম্পূটিতভাবে। সম্পুটিত সহস্র চণ্ডীপাঠ শুরু হলো। কাশীর আনন্দময়ী আশ্রমে। মোট ৮৭ জন ব্রাহ্মণ এই কার্যে ব্রতী হলেন। ৮৪ জন ব্রাহ্মণ এক সুরে একত্রিত হয়ে পাঠ আরম্ভ করলেন। সে এক অপূর্ব ব্যাপার। ভোর হতেই চণ্ডীর সংস্কৃত শ্লোকের সুললিত ভক্তিসুধাদ্রাবিত ধ্বনি গঙ্গার তরঙ্গধ্বনির মত শান্ত সুরে চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে ভেসে চললো। কি সে ভাব! কি সে সুর!

অপরদিকে সুরু হয়েছে রামায়ণ সম্মেলন। শ্রীবিন্দু মহারাজজী রামায়ণ সম্মেলনের সভাপতি। এই সম্মেলন উপলক্ষে এলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দজী, মন্ত্রী পণ্ডিত কমলাপতি ত্রিপাঠী, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জন্মজয়ন্তী মহোৎসব সুরু হয় রামার্চনার দ্বারা। শ্রীশ্রীহরিবাবার বিশেষ আগ্রহ ও ইচ্ছাতেই ১লা মে ভোর হতেই সুরু হয় রামার্চনার উৎসব। আচার্য পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রীজী, পূজক মনোহর। পূজান্তে প্রত্যেক দিনই শ্রীশ্রীহরিবাবা স্তব পাঠ এবং রামনাম কীর্তন করতে লাগলেন। মাও অর্চনার সময় প্রতিদিনই উপস্থিত থাকতেন।

কলকাতার প্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী শোনালেন রামায়ণ গান।

ওদিকে ৩রা মে থেকেই প্যাণ্ডেলে সকালবেলা রাসলীলা অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়। এই রাসলীলা দেখবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ বালক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাবেশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমহাপ্রভুর জীবনলীলা অবলম্বন করে এই রাসলীলা অভিনয় হতে লাগলো। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজও রাসলীলা দর্শন করে মুগ্ধ হন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহাত্মা ও বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীরা ভাষণ দিতে লাগলেন। জগদ্‌গুরু রামানুজাচার্য দেবনায়কাচার্যও ভাষণ দেন। যোগ-বশিষ্ঠের উপর বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ আত্রেয়। পণ্ডিত মঙ্গলদেব শাস্ত্রী, ডাঃ মহাদেব শাস্ত্রী, ডাঃ রাজবলী পাণ্ডে, সন্ত ছোটে মহারাজ, অধ্যাপক যাজ্ঞিক, শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন।

এইভাবে সৎসঙ্গও চললো সুশৃঙ্খলভাবে। সর্বপ্রথমে বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীবিন্দু মহারাজ ভাষণ দিলেন। তারপর পণ্ডিত বেদ-সুখানন্দজী মঙ্গলাচরণ পাঠ করলেন। পণ্ডিত ভগবতীপ্রসাদ পৌবাণিক মঙ্গলাচরণ পাঠ করলেন। এর পরই সুরু হয় ভজন কীর্তন। মাও ভাবানন্দে বিভোর হয়ে কীর্তনে যোগদান করেন। সৃষ্টি হয় এক অনির্বচনীয় পরিবেশের।

ইতিমধ্যে যোগীভাই (সোলনের মহারাজা) একদিন অলৌকিক দর্শন করলেন। তখন সহস্র চণ্ডীপাঠ চলছে। সকালে আশ্রম থেকে প্যাণ্ডেলে যাওয়ার সময় মাতৃমণ্ডপের জানলা দিয়ে দেখলেন ৺চণ্ডীদেবীর ঘটের স্থানে আসনে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন (কালীমূর্তি) কালিকা দেবী। ওঁর সন্দেহ হওয়ায় নিকটে গিয়ে ভাল করে দেখলেন সত্যসত্যই কালীমূর্তি। মনে মনে ভাবলেন বাংলাদেশে হয়তো ৺চণ্ডীদেবীর ঘটের পরিবর্তে কালীমূর্তি স্থাপনের রীতি আছে। তাই এখানেও বোধ হয় কালীমূর্তিই স্থাপনা করা হয়েছে। অবশেষে প্রণাম করে প্যাণ্ডেলে চলে গেলেন। কিন্তু ফিরে আসবার সময় লক্ষ্য করে দেখলেন যে কালীমূর্তির স্থানে ঘটই বিরাজমান। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন তবে কি দেবী কৃপা করে তাঁকে দর্শন দিলেন? একদিন শ্রীশ্রীমাকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। মা শুনে বললেন, দেখ, দেবী নিজে প্রকট হয়ে পূজা গ্রহণ করেছেন।

উৎসবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজীর ইচ্ছাক্রমে কাশীর ললিতাঘাটে ত্রিপুরাসুন্দরীদেবীর মন্দিরে আবার শত চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করা হলো। ললিতাঘাটের উপরেই থাকেন সন্ন্যাসীপ্রবর শঙ্কর ভারতীজী। তিনি উৎসবের মধ্যেই হঠাৎ একদিন আনন্দময়ী মাকে দেবীমূর্তিতে দর্শন করে অভিভূত হন। আরও অনেক অলৌকিক দর্শন হয়। এইসব কথা কিছু কিছু ভারতীজী অবধূতজীর নিকট ব্যক্ত করলে, অবধূতজীই শতচণ্ডী পাঠের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে সমস্ত আয়োজন করে সুবর্ণপাত্রে যন্ত্র এঁকে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা হয় এবং শত চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়। ২৩শে মে ১৯৫৬ সন। ২৭শে পাঠ সমাপ্ত হলো এবং সেইদিনই হোম দক্ষিণা ব্রাহ্মণ বিদায় আদি নিষ্পন্ন করা হলো। শ্রীশঙ্কর-ভারতী বলেন, মা সাক্ষাৎ চিদানন্দস্বরূপ। জয়ন্তী উৎসবের মধ্যে যতরকম অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয় তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয় তুলাদান উৎসব। তুলাদণ্ডের পাল্লায় মাকে বসিয়ে মায়ের শরীরের ওজনের বস্তু স্বর্ণ রৌপ্য অষ্টধাতু অন্নবস্ত্র ঘৃত মধু প্রভৃতি দান করাই তুলাদান উৎসব। কুসুম ব্রহ্মচারী যজমান, সাহিত্যাচার্য মহাশয় আচার্য এবং চব্বিশজন পণ্ডিত ব্রতী। আচার্য ও ব্রতীদের বরণ করে উৎসব আরম্ভ হলো। শান্তি কুম্ভের উপর স্বর্ণনির্মিত নারায়ণ ও যমের মূর্তি স্থাপনা করে। ষোড়শোপচারে রাজোচিত-ভাবে পূজা সুরু হলো। শত শত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদের মেলায় মুখর হয়ে উঠেছে উৎসব প্রাঙ্গণ। সকলেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে মা কখন আসবেন। লোকে লোকারণ্য। সমস্ত আশ্রম যেন জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। তুলামণ্ডপের বাইরে সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা ও ব্রহ্মচারীদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পূজা ও হোম শেষ হলে নারায়ণ স্বামী ও পরমানন্দ স্বামীজী মাকে নিয়ে এলেন মণ্ডপে। ভাবময়ী মা আনন্দময়ী তখন কি যেন এক অলৌকিকভাবে পরিপূর্ণ। চোখ ঢুলু ঢুলু, মাথায় গায়ে বস্ত্রাদির

প্রতি কোন খেয়াল নাই। আধ-আধ জড়ানো কথা সমবেত ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ করে তুললো। অবধূতজী ও স্বামী পরমানন্দ মাকে ধরে দক্ষিণের পাল্লায় তুলে দিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভক্তরা অভ্যর্থনা জানালো। মা তুলাদণ্ডে বসেই অস্ফুটস্বরে 'নারায়ণ নারায়ণ' বলে উচ্চারণ করলেন। মা'র কোলে নারায়ণশিলাসহ সিংহাসন বসিয়ে দেওয়া হলো। আচার্য এসে মা'র এক হাতে নারায়ণের স্নুবর্ণ মূর্তি, অপর হাতে যমের মূর্তি দিলেন। মা তখন আসন করে বসে আছেন। স্বর্গীয় ভাবের প্রবাহে দেহ মন আচ্ছন্ন। অপরূপ মূর্তিতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছেন।

স্নুরু হলো তুলাদানের কাজ। অষ্টধাতু দিয়ে মাকে ওজন করা হলো। চতুর্দিক থেকে ভেসে এলো জয়োল্লাসের আনন্দমুখর ধ্বনি। তারপর একে একে বাসমতি চাল গম যব মাসকলাই তিল গব্যঘৃত ফল গরদ সূতীকাপড় এবং চিনি দ্বারা ওজন করা হলো। বাতাসা ও এলাচদানা দিয়েও শ্রীশ্রীমাকে ওজন করা হলো। সে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

উৎসবান্তে শাস্ত্রীয় বিধিমত চতুর্বেদ পাঠ স্নুরু হয়। গঙ্গাতটে ষাটজন ব্রাহ্মণের স্নুস্বর কণ্ঠের বেদধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আশ্রমের বায়ুমণ্ডল।

দানের জিনিসপত্রের মধ্যে তৈজসপত্রাদি চাল গম যব আদি যাবতীয় দ্রব্য শাস্ত্রীয় বিধিমত ব্রাহ্মণদের দান করা হলো, আর বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণ ও গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলি করা হলো। রূপা আদি ডাঃ পান্নালালজীর ইচ্ছানুসারে বৃন্দাবন ধামের মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবাকার্যে ব্যয়ের জন্য দেওয়া স্থির হলো। এইভাবে স্নুসম্পন্ন হলো তুলাদানের উৎসব।

অপরদিকে অনির্বচনীয় এক পরিবেশের মধ্যে শিব অর্চনা স্নুরু হয়। অন্নপূর্ণা মণ্ডপে, স্মৃতিমন্দিরে। এক লক্ষ বিল্বপত্র অর্পণ

করেন ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ও যোগী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। উৎসবান্তে দুইদিনই দরিদ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণ ও দণ্ডী সন্ন্যাসীদের ভোজন করান হলো। ত্রুটীহীন, স্বর্গীয় সুষমায় সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে উৎসব। পূজা। অর্চনা। স্বয়ং জগজ্জননী যেখানে উপস্থিত সেখানে তাঁরই কৃপায় জয়ন্তী উৎসবের প্রতিটি কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। কার উৎসব? কার ক্রিয়া? মা বলেন, 'এক ছাড়া ত দুই নাই। এক তিনিই ত সব। যাঁর ক্রিয়া তিনিই করিয়েছেন। আনন্দের কথা। তাঁর যে নিত্যই নব নব ক্রিয়া। অনন্ত একত্বের প্রকাশে ত একমাত্র ঐ ঐ ঐ। এক ব্রহ্মমুখীর অনুকূল ক্রিয়া। সর্বরূপী যে মা তা জান না? যা কিছু তাঁরই রূপ। তাঁরই ক্রিয়া। তাঁরই কৃপা। তাঁর নিকট যে কৃপার অখণ্ড ভাণ্ডার রয়েছে। তাঁর কৃপা ত অহৈতুকী। সর্বদাই কৃপার বর্ষণ হচ্ছে।'

২৭শে মে রাত্রিতে সম্পন্ন হলো শ্রীশ্রীমায়ের মূল তিথিপূজা। প্যাণ্ডেলে। প্রায় দুই সহস্র ভক্তের উপস্থিতিতে এই পূজা সুরু হয়। নব-নির্মিত বিশাল সিংহাসনটিও পূজা-স্থানের মধ্যস্থলে রাখা হয়েছে। পশ্চিমদিকে বসেছেন মহাত্মাবৃন্দ। প্যাণ্ডেল থেকে আশ্রম পর্যন্ত পথটি ফুল পাতায় সজ্জিত হয়ে অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সুসজ্জিত পাল্কিতে কীর্তন করতে করতে মাকে নিয়ে আসা হলো পূজাস্থানে। মা পূজামণ্ডপে এসে সিংহাসনের সিঁড়ির উপরেই বসে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীশ্রীহরি-বাবাজী ও অবধূতজীর একান্ত আগ্রহ ও প্রার্থনায় সিংহাসনের উপরে উঠে বসলেন। দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল একভাবে বসে মা ভক্তের পূজা গ্রহণ করলেন। পূজা করলেন ব্রহ্মচারী কুসুম। ভোর পাঁচটায় পূজা শেষ হয়ে আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি হলো। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও উষাকাল পর্যন্ত বসে থেকে মা'র চরণে পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন। সুশৃঙ্খলভাবে

ভক্তবৃন্দ একে একে এসে মাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করা শেষ হলে মাকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে পাল্কিতে বসিয়ে কীর্তন করতে করতে আশ্রমে নিয়ে আসা হলো। শ্রীশ্রীমা তখন এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয়ভাবে বিভোর। দেহ অরুণ বর্ণে রঞ্জিত। অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে লীলায়িত। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। জ্যোতির্ময়।

আশ্রমে এসে মা গুহায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তখনও তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল ইহজগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই যেন নেই। চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত। কণ্ঠস্বরে অস্পষ্টতার আভাষ।

তিথিপূজান্তে উৎসবের সমাপ্তি ঘটলো। ভক্তদের মনে এক ঔদাসীন্য, বিষাদের ছায়া। কত দিনের কত চেষ্টা কত পরিকল্পনা কত আয়োজনের আজ সমাপ্তি ঘটলো। সকলেব মুখেই এক কথা, 'যা দেখলাম যা শুনলাম যা পেলাম তুলনা তার নাই।'

অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'মহাভারতে পুরাণে রাজসূয় যজ্ঞের কথা অনেক পড়েছি অনেক শুনেছি। কিন্তু আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম।'

গুরুপ্রিয়াদেবী বললেন, 'সত্যই এ যুগে যে এইরূপ বিরাটভাবে উৎসব সম্ভব, এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধিবৎ রাজযজ্ঞাদি সম্ভব তা প্রত্যক্ষ না করলে কেউ কল্পনাও করতে পাববে না।'

ভাবতের মহান অতীতের ধর্মসাধনার, ত্রিকালদর্শী ঋষিদের প্রবর্তিত নানা যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা ঈশ্বরানুভূতির সাধনাব শেষ বাহক জীবন্ত বিগ্রহ হলেন আনন্দময়ী মা। বর্তমান যুগের অধঃ-পতিত বহির্মুখ জীবের কল্যাণার্থেই মায়ের এইসব লীলাখেলা। নানা যাগযজ্ঞ উৎসবাদি গীতা ভাগবৎ চণ্ডীপাঠের প্রেরণা দান। ছোট বড় নানা কার্যের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে অন্তর্মুখীন হওয়ার, সেই চবম সত্যের উপলব্ধিতে পৌছানোর অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হলে তাঁর অনুগ্রহ মানুষের জীবনে

নেমে আসে। যে অজ্ঞান তার কাছে তিনি বহন করে আনেন দিব্যজ্ঞানের জ্যোতি। দুর্বল যে তাকে তিনি দেন অপরাজেয় সংকল্পের দৃঢ়তা। পাপের পঙ্কে নিমগ্ন যে, তাকে করেন মালিন্য থেকে মুক্ত একটি শুচিশুভ্র আত্মা। দুঃখে যে ভারাক্রান্ত তাকে তিনি নিয়ে যান আনন্দধামে। এই সরল বিশ্বাসটুকু এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভের জন্যই তিনি ভক্তদের নানাধর্মীয় অনুষ্ঠান করবার প্রেরণা দেন। বিষয়মুখী মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে বিশ্বাসের পাথেয়রূপে এইসব উৎসবাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। মা অবশ্য রহস্য করে বলেন, 'আমি কিছুই বলি না, তোমরা যেমন বলাও তাই বলি। যা হয়ে যায়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়ই সব হয়, তা ত জান ? যাঁর ভার তিনিই গ্রহণ করেন ত। তবে ইহা মনে করা মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্ম পেয়ে ইষ্টচিন্তায় মন দেওয়া। মানুষ-মাত্রেরই কর্তব্য অমৃতগতি নেওয়া। ভগবৎ প্রকাশের জন্যই ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকেই ধর্ম বলা হয়। যা অক্রিয়া তাই অধর্ম। ধর্ম ত একই।'

তেরো

'মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করতে নেই। তাতে কখনও কখনও তার অকল্যাণ হয়। এই রকম অনেক ঘটনার কথা শোনা গেছে। আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করা। তিনিই দেন আবার তিনিই নিয়া নেন। সুতরাং মানুষের আর কি করবার আছে।'

শ্রীশ্রীমা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন একজন সন্তানহারা বৃদ্ধাকে। ডেরাডুনে। আবার বলছেন, 'কি করবে মা? যাঁর জিনিস তিনিই এই কয়দিন তোমার কাছে রেখে সেবা করিয়ে নিলেন। সেও তোমার কাছ থেকে যে কয়দিন প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করলো। তারপর তিনি নিজের জিনিস নিজেই ফিরিয়ে নিলেন। যখন তোমার কান্না আসবে ভগবানের জন্য কাঁদবে। ইষ্টের জন্য কাঁদবে।' এই বলেই মা নিজের মাথাটি বৃদ্ধা মহিলাটির বুকের মধ্যে রাখলেন। বৃদ্ধা মাকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদলো। তারপর ধীরে ধীরে মন শান্ত হয়ে এলো।

আত্মার সদ্গতি না হলে সে-যে আবার ফিরে আসে এই দুঃখের সংসারে। এই প্রসঙ্গে মা একটি সত্য ঘটনার কথা বললেন, 'বহুদিনের কথা। তখন তারাপীঠে থাকা হয়। অনেকেই আসতো। একটি মহিলা তার বছর এগারো বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে রোজই আসতো। তার বড় মেয়েটির বিয়ে স্থির। এমন সময় হঠাৎ মারা গেল। মহিলাটি শোকে খুবই কাতর হলো। কান্নাকাটি করতো। পরবৎসর আবার যখন তারাপীঠে যাওয়া হলো, মহিলাটি এসে জানালো সেই এগারো বছরের মেয়েটিও মারা গেছে। আর কি কান্না! যেন থামতে চায় না। কোন সান্ত্বনা বাক্যও শুনতে চায় না। শোকে মুহ্যমান।

তার ঠিক এক বৎসর পর আবার তারাপীঠে যাওয়া হয়েছিল। এবারে সে এলো দেখা করতে এক মাসের একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে। তারপর বললো সব কিছু আনুপূর্বিক। যেমন যেমন ঘটেছিল। দিনরাত যখন কান্নাকাটি করতো আকুল হয়ে ছোট মেয়েটির জন্য, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলো, মেয়েটি তার সমবয়সী অনেক মেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে এক জায়গায় বসে আছে। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। স্থানটি খুবই মনোরম। আবার একদিন তার স্বামী স্বপ্ন দেখলো, মৃত মেয়েটি করুণভাবে বলছে, বাবা, মা আমার জন্য বড়ই কান্নাকাটি করছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। এবার মা'র কোলে চললাম। এই বলেই মেয়েটি যেন একটি শিশুমূর্তিতে রূপান্তরিত হলো। আর সেই শিশুকে তার বাবা মা'র কোলে দিল। ঐ স্বপ্ন দেখবার পরই মহিলাটির গর্ভ সঞ্চার হয়। তার এক বৎসরের মধ্যেই এই কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হলো। সেই মেয়েকে নিয়েই যে সে এসেছে।

তাই তো বলা হয় মৃত আত্মার জন্য কান্নাকাটি না করা। তাতে তার আত্মা ব্যথিত হয়, সদ্‌গতি হয় না। স্ব-স্থানে উঠতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে বাধা না দেওয়াই ঠিক। সংসারের সঙ্গ, তার ভিতর শান্তি কোথায়? যেখানে শূন্য সেইখানেই ত পূর্ণ। তাই তো ভগবানের কাছে আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করা। যার উপর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা থাকে তার শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনাই কর্তব্য। শরীরটার জন্য কান্না মঙ্গল নয়। ভগবানই হইল একমাত্র শান্তিদাতা। ভগবানের উপর নির্ভর। তিনিই যে একমাত্র আশ্রয়। সুখে দুঃখে শোকে তাকেই চিন্তা করা। তাঁর ব্যবস্থাতেই সব নয় কি? শরীরটা ত তোমাদেরও। তোমাদের ব্যবস্থা, তোমাদের যে, তাঁর নয় কি? সংসারটা যে এইরূপই। সংসারে শোক দুঃখ থাকবেই। সংসারে পরম সুখের আশা হতেই পারে না। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি—একেই

ত সংসার বলে। জান না বুঝি? বাসনার বীজ এই সংসারে টেনে আনে। তবুও তাঁর দিকেই লাগিয়া থাকতে হয়। একের মধ্যে যাইতে চেষ্টা করতে হয়। সেই পথে যাইতে যে সাহায্য করে সেই প্রকৃত বন্ধু। যে অবস্থায় থাক চঞ্চল ও অস্থিরভাব যেন প্রকাশ না হয়। স্থির সেবাব্রত আর তার উপর নির্ভর।'

মা'র কাছ থেকে অপার শান্তি নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটি চলে গেলেন। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মা আবার বলছেন। একজন প্রশ্ন করলেন, —ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হন তবে জগতে এত অশান্তি দুঃখ কেন? তিনি ইচ্ছা করলেই সব দূর করতে পারেন।

ভগবান ত কারো পরামর্শ নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেননি। তিনি যদি অন্যভাবে আবার জগৎ বানাতেন তখনও তোমাদের প্রশ্ন থেকেই যেতো। যদি ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয় তিনি মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান, তাহলে এ জাতীয় প্রশ্ন মনেই আসতে পারে না। দুঃখ কি? অশান্তি কি? সবই ত মনের। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি—এই নিয়েই ত সংসার। এসব ত থাকবেই। বিষয় ত বিষ। বিষয়ের মধ্যে থেকে ত আর অখণ্ড শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। আর মানুষ ত কর্মপূরণের জন্য জন্ম নেয়। আর জগৎ মানেই ত গতি। আসা-যাওয়া ত আছেই। এই বোধে গেলে, বুঝ ঠিক ঠিক হলে, দুঃখই বা কি,—আর অশান্তিই বা কোথায়? আনন্দ আনন্দই। নিরানন্দ আর কোথায়? স্বরূপ প্রকাশ হলে, আবরণ উন্মোচন হয় অমৃত। আত্মারামের প্রকাশের জন্য আবরণ হটাবার চেষ্টা করা। তুমি ত অমৃত, আত্মারাম। কথা একটা। আর কোন কথাই নাই। তাইতো বলা হয় আত্মচিন্তার অনুকূল চিন্তা কর্তব্য। একমাত্র ঐ। ঐ। ঐ।

প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমা বললেন।

এবারে মা বলছেন শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে। প্রশ্ন হলো পিতৃশ্রাদ্ধের দরকার আছে কিনা? পিতার ত জন্ম হয়ে গেছে বোধ হয়?

জন্ম হয়ে গেলেও শ্রাদ্ধের দান পৌঁছায়। সন্তানের কর্তব্য শ্রাদ্ধ করা। জন্ম হলেও একটা তৃপ্তি হয়। করা দরকার। এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

দুই বন্ধু। একজন ব্রাহ্মণ, একজন ফকির। বন্ধুত্বও খুবই গভীর। একদিন ব্রাহ্মণ বন্ধুটি এক নিরালায় বসে আছেন। হঠাৎ পাকা কাঁঠালের সুগন্ধ নাকে ভেসে আসতে লাগলো। আশ্চর্যান্বিত হলেন। কারণ তখন কাঁঠালের সময় নয়। আশেপাশে বাগানে খোঁজ করলেন। অনেক অনুসন্ধান করেও আশেপাশে কোথাও কারও বাড়িতেও কাঁঠালের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তিনি বিস্মিত ও অভিভূত চিত্তে এসে উপস্থিত হলেন ফকির বন্ধুটির কাছে। সকল কথা খুলে বললেন ফকির বন্ধুটিকে। ফকির সাহেব ছিলেন একজন শক্তিধর সাধক। অলৌকিক শক্তির অধিকারীও ছিলেন। সবকিছু শুনে ফকির বন্ধুটি একটু চিন্তান্বিত হলেন, তারপর মৃদু হেসে ব্রাহ্মণ বন্ধুটিকে সঙ্গে আসতে বললেন। দুজনে পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতে একটি নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত হলেন। নদীপাড় হয়ে একটু গিয়েই দুজনে দেখতে পেলেন একটি কুটিরের ভিতর বসে একজন ব্রাহ্মণ পাকা কাঁঠাল দিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করছেন। জিজ্ঞেস করে জানলেন, তাঁর স্বর্গীয় পিতা নাকি কাঁঠাল খুব ভালবাসতেন। তাই অসময়ে বহু কষ্ট করে এই কাঁঠালটি সংগ্রহ করে এনেছেন। শ্রাদ্ধে অর্পণ করবেন বলে। এইবার ফকির সাহেব বললেন বন্ধুকে, 'দেখ হে এই ব্রাহ্মণটির তুমিই গত জন্মে পিতা ছিলে।' তুমি তখন পাকা কাঁঠাল খুব ভালবাসতে। তাই শ্রাদ্ধে দেওয়া কাঁঠালের গন্ধ তুমি দূর থেকে তোমার স্থানে বসেও পাচ্ছিলে।'

গল্পশেষে মা আবার বলছেন, তাই তো বলা হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে কোন বস্তু অর্পণ করা হয় তার দ্বারা তার আত্মার তৃপ্তি হয়ে থাকে। শ্রদ্ধার দান সেখানে পৌঁছে। জন্মলাভ হলেও। আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায় শ্রাদ্ধ করে কি লাভ? মৃত ব্যক্তি কিভাবে তা ভোগ করবে? কিন্তু এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে যা সত্য। সবই হতে পারে। ভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আত্মার ত মৃত্যু নাই। দেহত্যাগ হয় মাত্র।

এবারে মা ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা যখন ভোগের দিকটা ছেড়ে এখানে এসেছ তখন ভালো করে সাধন-ভজনে লাগা দরকার। যতটা শক্তি সবটা এদিকে প্রয়োগ কর। এই প্রসঙ্গে মা আবাব একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

এক ছিলেন সাধক। গুরুর আদেশে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের নির্জনে বসে সাধন-ভজন করছিলেন। সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো। সাধনায় নিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট হলেন এক মহাপুরুষ। হঠাৎ একদিন সেই দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন দীর্ঘকায় মহাপুরুষ সাধকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। ধীর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার সাধনার নিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে মুক্তি বর দিতে চাই।

প্রত্যুত্তরে নবীন সাধক নম্রকণ্ঠে বললেন, প্রভু, ক্ষমা করবেন, আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞেস না করে আপনার দেওয়া কোন বরই গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি না। অন্তর্হিত হলেন মহাপুরুষ। কিছুদিন পর গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সবকিছু নিবেদন করলেন শিষ্যপ্রবর গুরুদেবকে। গুরুদেব সবকিছু শুনে বললেন, কোন বর না চেয়ে তুমি ভালই করেছো। মুক্তি থেকে বড় যে ভক্তি ও প্রেম, তুমি তারই অধিকারী হবে। কোন চিন্তা নাই। গুরুর কথায় নবীন সাধকের চিত্তও শান্ত হলো।

গল্পশেষে মা বলছেন, ওঁরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধক কিনা। তাই ভক্তি প্রেমকে মুক্তির চেয়েও বড় স্থান দিয়েছে।

আসল কথা নিষ্ঠা চাই। সকল কাজেই ধৈর্য সহ্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। সাধন-ভজন করতে করতে সর্বদাই যদি মনে হয়, কি পেলাম! কি হলো! তাহলে কিছু পাওয়া বা কিছু হওয়া খুবই মুস্কিল। এই দিকে খেয়াল না দিয়ে, সেই পথে চলতে থাকা। তাতেই যা পাওয়ার যা হওয়ার ধীরে ধীরে সবই প্রকাশ পাবে।

আবার প্রশ্ন হলো মা কাকেও ভালবাসেন কি না? কেউ কেউ বললেন, মা যদি ভাল না বাসেন তাহলে মা'র কাছে এত লোক আসে কি করে?

নারায়ণ স্বামীজী বললেন, গত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি যে মা'র মধ্যে ভালবাসার নামগন্ধও নেই।

মা অমনি বলে উঠলেন, দেখ দেখ দণ্ডী সাধু কি বলছে। ঠিকই ত। ভালবাসাবাসি ত দুইজন থাকলে। যখন কেবল বল একমাত্র তিনিই সব, তখন কে কাকে ভালবাসে? তবে জাগতিক দৃষ্টির দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, সকলেই ছোট্ট শিশুকে দেখলে কতই না আদর করে, ভালবাসে। কিন্তু এই শরীরটার ত সবই অদ্ভুত। এমন একটা সময় গেছে, যখন যদি দেখা যেত যে কেউ শিশুকে আদর করছে, তখন শিশুর সৃষ্টির কথা খেয়াল হয়ে ভিতর থেকে যেন বমির ভাব আসত।

সবটাই এ শরীরের কাছে সমান। স্নেহ মমতা ভালবাসাই বল আর ভগবৎ প্রসঙ্গই বল। দেখ, এই শরীরের কাছে সৎসঙ্গে বসে থাকাও যা, আর সংসারী মেয়েদের কাছে তাদের সংসারের কথা শুনাও তা। এতটুকুও তফাত নেই।

আবার একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, সবই যদি তাঁর ইচ্ছায় হয় তবে রোগও ত তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। যদি তাই হয় তবে ত রোগ দূর করবার জন্য আমাদের চেষ্টা করবার দরকার নেই।

—তা কেন হবে? এই যে ওষুধ দেবার জন্য তোমার চেষ্টা এও ত তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে। আবার এক তিনিই যে সব। তুমিই রোগরূপে, ওষুধরূপে, চিকিৎসারূপে, সবরূপেই যে তুমি।

শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন সমবেত ভক্তদের লক্ষ্য করে, সংসারের মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাকা। মালিক হলেই যত গণ্ডগোল। মালী হতে পারলে আর গণ্ডগোল নেই। এই সংসারটা ভগবানের, আমি সেবক মাত্র। তাঁর নির্দেশমত আমি সেবা করে যাবো। এই ভাবটা সর্বদা রেখে যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকা যায় তবে আর কোন নূতন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। কেবল প্রারব্ধ ভোগ করে যাওয়া মাত্র।

এক ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অভাবেই আর সমস্ত আশ্রমগুলির নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হয় না। বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ি টেকে না। এও সেইরকম আর কি। আশ্রম মানে যেখানে শ্রম নেই। আবার ভগবানকে বাদ দিলে সবই ত শ্রম। বিশ্রাম তবে কোথায়? গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি তদ্‌জ্ঞানে সেবা করা যায় তবেই ঠিক ঠিক আশ্রম বাস হয়। পতিকে পরমপতি জ্ঞানে সেবা, পুত্রকে বালগোপাল জ্ঞানে সেবা আর স্ত্রীকে মহামায়ার অংশভাবে সেবা। তোমরাই ত বলে থাক,—'যত্র জীব তত্র শিব। যত্র নারী তত্র গৌরী।'

মা আজকাল সংযম পালনের উপর খুব জোর দিচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে মা বলছেন, দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়েছো, বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যায়। গাছপালা পশুপাখি কিছুদিন জীবিত থেকে নূতন গাছপালা পশুপাখি সৃষ্টি করে এ সংসার থেকে, পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি তাই করলে তাহলে আর তফাতটা রইলো কোথায়? জগতে সবই ত ক্ষণস্থায়ী। এই যে সুখের কথা বলো তাও ত এই আছে এই নেই! নিত্যসুখ অনন্তসুখ পাওয়ার পথের যাত্রী হও। সংযমী হও। সংযম পালন করতে চেষ্টা কর। সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন না পারলে অন্ততঃ মাসে একটি দিন

সংযতভাবে জীবনযাপন করবার চেষ্টা করা কর্তব্য। আশ্রমে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদেরও মা সংযম পালনের জন্য বলছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য স্বামী পরমানন্দ সকলেরই আদর্শস্থানীয়। গত জন্মোৎসবের সময় হতেই প্রায় এক বৎসর হলো সংযম পালন করছেন। আহারের নিয়ম কঠোরভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরে নির্বিকার-ভাবে পালন করছেন। দিনে মাত্র একবার বিনা নুনে সিদ্ধভাত এবং রাত্রে একটু দুধ। সমস্ত দিন রাত্রিতে আর কোনরূপ আহার্যই গ্রহণ করেন না। স্বামীজী এইভাবে সংযম পালন করে নবীন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমায়েরও বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রয়েছে স্বামীজীর প্রতি।

* * *

শ্রীশ্রীমা বলছেন গুরুপ্রিয়াদেবীকে সূক্ষ্ম দর্শনের কথা। মায়ের এমন সূক্ষ্ম দর্শন অবশ্য প্রায়ই হয়ে থাকে, তবে সব সময় প্রকাশ করেন না। শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়, দিদি,* একটা মজার কথা শোন। দেখছি একটা পুকুর। তার মধ্যে মাছ আছে। কোনও কোনটির পেটে ডিমও আছে। একটা লোক সেইগুলিকে মারছে। এর মধ্যে হল কি, জলস্তম্ভ ত এই শরীর কখনও দেখে নাই, ঐ পুকুরের মধ্যে থেকে লম্বা হয়ে একটা জলস্তম্ভ উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে সেই স্তম্ভটা উঠে পাড়ে আসল। এসে মাটির উপরই ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে দুইখানা পা হয়ে গেল আর পরমুহূর্তেই দেখা গেল একটি পুরুষ মূর্তি। গায়ে একখানা চাদর। তাও যেন জল দিয়েই তৈরী। শরীরটা প্রথমে ছিল জলময়। পরে স্বাভাবিক মানুষের মত হলো। তারপর ধীরে ধীরে সেই মূর্তি আবার জলের দিকেই যেতে লাগলো। এই শরীরটা পুকুরের পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ঐ মূর্তিটি তা বিশেষ লক্ষ্য না

* শ্রীশ্রীমা গুরুপ্রিয়াদেবীকে দিদি বলে সম্বোধন করেন।

করেই চলে যাচ্ছে। তখন এই শরীর সামনে গিয়ে বললো, 'দেখ, তোমার জন্যই আমার এইখানে এইভাবে প্রকাশ। তোমার জন্যই এখানে আসা।' এই বলতেই সে এই শরীরটার দিকে চেয়েই যেন কেমন হয়ে গেল। ভাবেরও পরিবর্তন হয়ে গেল। শিশুর মত এই শরীরটার কাছে এসে বসলো। এই শরীরের কাছেই আম্বলী পাতা ছিল, তাই কিছুটা উঠিয়ে তাকে দিয়ে বলা হল, 'এই পাতা তুমি এই শরীরের স্মৃতিস্বরূপ কাছে রাখ। এই শরীরের সঙ্গে যে দেখা হলো তারই নিদর্শনস্বরূপ। সে যত্ন করে তা নিল এবং যোগ ক্রিয়ায় নিজের শরীরের মত করে নিল যেন কাছেই রাখা যায়। এই শরীর তখন তার মাথায় হাত দিল। তখন এই শরীরের যেন কোনরকম সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। অবশেষে সে ধীরে ধীরে জলের দিকে চললো। কিন্তু জলের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলছে যে জলের দিকে যেতে পারছে না। এই শরীরটা* যেন টেনে আনছে। তখন এই শরীর বললো, 'না, চল, আমি সঙ্গে করে তোমায় নিয়ে জলে রেখে আসি। তোমাকে জলে রেখে তবে আমার যাওয়া।'

তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে জলে যাওয়া হলো। সে জলে এসেই ডুব দিল। আর অন্তর্হিত হলো। পরমানন্দও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছে অবাক-বিস্ময়ে। অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভোলানাথ। নীরব নিথর ঠিক যেন বিগ্রহের মূর্তি।

গল্পশেষে মাও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মা-ই জানেন মায়ের এই সূক্ষ্ম দর্শনের কাহিনীর গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য। চিন্তাশীল তাত্ত্বিক ভক্তরা এ রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হবেন।

---

* 'আনন্দময়ী মা' নিজেকে কখনও 'আমি' বলে উল্লেখ করেন না। নিজের সম্বন্ধে পরোক্ষ উক্তি করে বলেন, এই শরীরটা, এই দেহ, এই ছোট্ট মেয়েটি ইত্যাদি।

মার্কিন যুবক জ্যাক। কয়েক মাস হলো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আছে। মা নাম দিয়েছেন জয়ানন্দ। সে এক অদ্ভুত দর্শনের কথা বলছিল। সে যখন জাহাজে আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আসছিল, মন কেন জানি বিষণ্ন হয়ে যায়। সম্পূর্ণ নূতন দেশ, অপরিচিত জায়গা। কোথায় থাকবে, হয়তো ভাল লাগবে না ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তা তার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল। হঠাৎ অভিভূত ও বিস্মিত হয়ে দেখলো সমুদ্রের উপরে শূন্যে এক দিব্য স্ত্রী-মূর্তি। ভারতীয় দেবীমূর্তি। পরমুহূর্তেই সেই মূর্তি অন্তর্হিত হলো। দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় এই মূর্তি দর্শন করে যুক্তিবাদী আমেরিকান যুবক জ্যাক শুধু বিস্মিতই হলো না চিন্তান্বিতও হলো, এ কি করে সম্ভব? কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কোন উত্তর মিললো না। তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে এলো। মা তখন কাশীতে ছিলেন। এক বন্ধু তাকে মাতৃদর্শনে নিয়ে এলো। আর হতবাক হয়ে জ্যাক তাকিয়ে রইলো শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মুখের দিকে। এই মূর্তিই ত সে দেখেছিলো সমুদ্রের মধ্যে শূন্যে জাহাজে থাকতে। পরম শক্তিময়ী বিশ্বজননীরূপে আনন্দময়ী মাকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে মায়ের আশ্রয়েই রয়ে গেল মা'র সন্তান মিঃ জ্যাক।

মা বলছেন, 'দুশ্চিন্তা কেন হয় জান? ভগবানকে দূরে রাখলেই দুশ্চিন্তা হয়। দুর্বুদ্ধির অর্থও তাই। ভগবানকে দূরে রাখার নাম দুর্বুদ্ধি অথবা তিনি দূরে এই যে বুদ্ধি ইহাই দুর্বুদ্ধি।'

শ্রীশ্রীমা আবার ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে সূক্ষ্মে প্রাণগোপালবাবুকে যেমন দর্শন করেছিলেন তাই লেখাচ্ছেন। প্রাণগোপালবাবু দেওঘরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর বিশেষ কৃপাপাত্র শিষ্য এবং আনন্দময়ী মা'র ভক্ত। বৃদ্ধ বয়স। অসুস্থ হয়ে দেওঘরেই আছেন। ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে মা তাঁকে দর্শনও দিয়ে এসেছেন। রসিক ভক্ত প্রাণগোপালবাবু বলেছিলেন,

ভীষ্মের শরশয্যায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন মাও তেমনি হঠাৎ তাঁকে দর্শন দিয়ে কৃপা করলেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় হলেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি দেওঘর থেকে মাকে পত্রদ্বারা পিতার সংবাদ দিয়েছিলেন, তারই উত্তর দিতে গিয়ে সূক্ষ্ম দর্শনের কথা মা বলছেন।

একটি জলাশয়। তার পাড়ে একটি বড় গাছ। আরও ছোট বড় অনেক গাছ রয়েছে। এই শরীরটা সেখানে। শরীরের কাছে একজন বুড়াবাবা, প্রাণগোপালবাবা আর কাতুমা। এদের পেছনে পেছনে গৌর। গৌরের স্বাস্থ্য ও রংটা আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এই শরীরটা কিছু দূরে মাটির উপর গিয়ে বসে পড়লো। বুড়াবাবা প্রাণগোপালবাবাকে বললেন, 'দেখ দেখ মাটিতে বসেছেন।' একজন একখানি আসন এনে কাছে রাখলো। নিজেবাও এই শরীরটার কাছেই বসে পড়লো। বুড়াবাবা ও প্রাণগোপালবাবার সঙ্গে আধ্যাত্মিক কত সুন্দর সুন্দর কথা খানিক সময় হলো। সেই স্থানটির পবিত্রতাপূর্ণ প্রভাবই কেমন যেন অন্য রকম। আধ্যাত্মিক আলোচনা হতে হতেই প্রাণগোপালবাবা ঐখানেই গায়ে একখানা চাদর টেনে শুয়ে পড়লেন। বেশ একটু নিজের ভাবে। এই ছোট্ট মেয়েটাও বাবার কাছে। ঐ সময় প্রাণগোপালবাবা চাদরের ভিতর থেকে নিজের হাত দু'খানি বের করে চুপে চুপে অতি আদরেব সঙ্গে শ্রদ্ধা গদ্‌গদ্‌ভাবে এই শরীরের ডান হাতখানি নিজের বুকের দিকে টেনে নিয়ে, শক্তি গ্রহণই বল আর স্পর্শই বল,—এই স্পর্শ বা শক্তি গ্রহণের কথাটা বাবার নিকট থেকেই প্রকাশ। এ শরীরের কথা না। এ শরীর হঠাৎ বাবার চাদরখানি সরিয়ে দিল। চাদর অর্থাৎ কি ? সঙ্কোচ ভাব। আবরণ। চাদরখানা সরাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ। সঙ্কোচশূন্য গম্ভীর স্থির তন্ময় ভাব।

বাবাকে বলা হল,—বাবা, এই জাতীয়টা এই প্রথম। বাবাও এই কথা শুনে সম্মতির ভাবে ঘাড়টা নেড়ে আনন্দে এই ছোট্ট মেয়েটাকে কাছে নিয়ে বসলো। শান্ত স্থির ভাবটা তার থেকেও গভীর। বেশ খানিকক্ষণ বসার পরে যাওয়ার ভাব প্রকাশ করে এই শরীরটার দিকে চাইল আর উঠে দাঁড়ালো। এই শরীরও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। এই শরীরের সঙ্গে তুইজন ব্রহ্মচারী। সকলে একসঙ্গে রওনা হলো। এই শরীরও সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর পর্যন্ত গেল। এই শরীর ফিরবার সময় প্রাণগোপালবাবা বললো, 'আমরা চলি। তুমি দেখো। সব সময়ই ত দেখতে হবে।' বুড়াবাবাও অস্পষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতেই হবে।'

এই সময় কাতুমা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে এই ছোট মেয়েটার হাত ধরে মুখের কাছে মুখ এনে আদরের সঙ্গে বললো, 'মা আমার দিকে খেয়ালটা তোমার রাখতেই হবে। সব সময়েই যেন কাছে থেকো।' প্রাণগোপালবাবা ও কাতুমার চেহারা বেশ উজ্জ্বল সুস্থ। জরা ও রুগ্নের দিকটা নয়।

এই পর্যন্ত লিখতে বলে মা আবার হাসতে হাসতে বলছেন, এইসব বাবার নিজস্ব ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে খেলা আর কি! বাবার কথা বাবাই জানে। সেদিন এমনি যোগাযোগটা হয়ে গেল। ভোরে গিয়ে বাবার কাছে পৌঁছানো হলো। তখনই সকলের অগোচরে এই ছোট্ট মেয়েটা বাবার মাথায় গায়ে বুকে পিঠে নিঃসঙ্কোচে হাত বুলিয়ে দিল। আসবার সময় সেটা আবার সকলের কাছে প্রকাশ করে আসা হলো। সবটাই কিন্তু আপন আপনি হয়ে গেল।

মা বলেন, 'কল্পিত রাজ্যের মধ্যে যে অবলম্বনে তোমাদের শরীর তারই আর একটা দিকে অন্তরালের ক্রিয়া। তুমিই ত বহু। নানারূপ নানা আকার নানাভাবে প্রকাশিত। এক এক আকারের এক এক ভাবের অভাব ভঞ্জনের রূপ আর কি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

তোমারই আদানপ্রদান। তোমারই অভাব, তুমিই স্বভাব ত তোমারই এই ক্রিয়া।'

*   *   *

তুমি-আমি, আমি-তুমি,
জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় আজ—সবি একাকার।
অখণ্ড পরমানন্দ, আব নিত্য নবশান্তি চিরবর্তমান।

চৌদ্দ

'দেখ, নানা নদ-নদীর জল সাগরে প্রবেশ করছে কিন্তু সাগরের তাতে কিছু পরিবর্তন হয় না। কখনো বিক্ষুব্ধ হয় না। সর্বদাই প্রশান্ত। ঠিক আনন্দময়ী মাও সর্বাবস্থায়ই নির্বিকার। সাগরের যেমন কূল-কিনারা নেই মাকেও সেরূপ কোন সীমার মধ্যে আনা যায় না।' বলছেন মহাত্মা ত্রিবেণী পুরীজী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানার নিকট খান্না হলো তাঁর কর্মভূমি। শুধুমাত্র নিষ্কিঞ্চন, বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তিই ছিলেন না। তিনি কর্মযোগীরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আনন্দময়ী মাকে দর্শন করে তাঁর সাহচর্য লাভ করে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করলেন। তিনি মাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, এ শরীর যেখানেই থাক মন মাতাজীর কাছেই। মা তাঁকে খান্নাবাবা বলে সম্বোধন করতেন। খান্নাতে একবার মায়ের জন্মোৎসবও পালিত হয়েছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী। অবধূতজী নিজেই মায়ের পূজা করলেন। চৌকীর উপর বিছানা পেতে সহস্রাধিক ফুল দিয়ে সাজিয়ে মাকে পূজা করলেন। রাত্রি এগারোটায় পূজা আবন্ত হলো আর পূজা শেষ হলো রাত্রি সাড়ে তিনটায়। মাও প্রস্তর বিগ্রহের মত বসে রইলেন। বৈদিক ও তান্ত্রিক মত মিলিয়ে অবধূতজী পূজা সম্পন্ন করলেন।

অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ ভক্তমণ্ডলী বসে আছেন। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। মায়ের মুখের ভাবেও জ্যোতির্ময়ী দেবী-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ভগবৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে জীবন্ত বিগ্রহে যেন রূপান্তরিত হলেন, জীবদেহধারী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। বৈদান্তিক সাধু কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী শুধুমাত্র পূজা করছেন না, এ

যেন বেদান্ত সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। মাও যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বৈদান্তিকের সাধনার পথে সহায়তা করছেন। 'আমি অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে অবস্থিত'—এই ধারণাই যেন মা পূজক, সাধকের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন।

একজন বেদান্তবাদীর পক্ষে সর্বসমক্ষে মাকে এইভাবে পূজা করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু মা স্বয়ং জীবন্ত বিগ্রহরূপে মূর্তি-পূজার সাকার আরাধনার প্রাণের কথাটি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। সকল মূর্তিই স্বয়ং ঈশ্বরের মূর্তি। সেজন্য সকল মূর্তিই সকল বস্তুই সকল মানবই সমভাবে পূজ্য। কারণ এর দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, শিব ও জীব, পরমাত্মা ও আত্মা, ব্রহ্মধাম ও মর্ত্যলোককে আমরা একই সঙ্গে পাই। কোনো কিছুকে ত্যাগ করতেই হয় না, কোনো কিছুকেই ঘৃণা করতে হয় না, কোনো কিছুকেই অশ্রদ্ধা করতে হয় না, কোনো কিছুকেই অবিশ্বাস করতে হয় না। উপরন্তু এই পৃথিবীর সর্বত্রই, এই মর্ত্যধামে, এই সংসারের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করি, প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করি, দৃঢ়ভাবে ধারণা করি সেই 'এককেই', সেই সনাতন সত্য 'এককেই'। সকল বস্তুকেই, সকল জীবকেই, পরব্রহ্মরূপে পরমেশ্বররূপে পরমাত্মারূপে দেখা জানা অনুভব করা উপলব্ধি করা। অতি সাংসারিক অতি ক্ষুদ্র-বদ্ধ বস্তুতেও স্বয়ং ব্রহ্মকে, স্বয়ং পরমেশ্বরকে, স্বয়ং পরমাত্মাকে, সেই মহাসত্য সচ্চিদানন্দ-রসঘন আনন্দোজ্জ্বল অমৃতনির্ঝরিণী আনন্দময়ী মা রূপে দেখা। তিনিই ত পরমতত্ত্ব, তিনিই বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। মা আছেন, সর্বত্রই আছেন। আমাদের মধ্যেই আছেন। একবার তাঁর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসার উদ্রেক যদি আমাদের মনে হয় তাহলেই ত সাকার-নিরাকার বিশ্বরূপ-অরূপ, বিশ্বলীন-বিশ্বাতীত, স্বপ্রকাশ-অপ্রকাশ প্রমুখ সকল অসংখ্য দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এক নিমেষেই। এই উদ্রেক এই ভাবোন্মাদনাই হয়েছিল অবধূতজীর শ্রীশ্রীমায়েরই কৃপায়।

কিভাবে মায়ের সংস্পর্শে এসে অবধূতজী ধীরে ধীরে মায়েরই ভাবে ভাবিত হয়ে পড়লেন, অবধূতজী নিজেই বলছেন, কৃষ্ণানন্দ অবধূতের ভাষায়,—'আমি যখন প্রথম মাকে দেখি, তখন শুনলাম যে পরমানন্দ স্বামী মা'র সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আছেন। পরমানন্দ আমাদের সঙ্গে উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রীর দিকে অনেকদিন ছিলেন। বেশ বিরক্ত সাধু। তাঁকে ঐভাবে মায়ের সঙ্গ করতে দেখে আমি একটু আশ্চর্যান্বিতই হয়েছিলাম। এই সময় মা সহস্রধারায় (দেরাডুনে) ছিলেন। অভয়ও সঙ্গে ছিল। আমি পরমানন্দ স্বামী এবং অভয়কে একান্তে ডেকে নিয়ে মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তাঁরা যা বললেন তার দ্বারা আমি মায়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হলাম না। এর পর আর একবার আমি রায়পুর আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। ঐ সময় মাকে বিশেষ-ভাবে জানবার আমি সুযোগ পাই। একদিন হঠাৎ একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী কয়েকজন শিষ্য ও ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি মায়ের সম্মুখে এসেই মায়ের দিকে পিছন ফিরে বসলেন। তারপর মায়ের সম্বন্ধে নানারকম অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করতে লাগলেন। উপস্থিত মায়ের ভক্তরা ভীষণ চটে গেল। মাযের দিকে তাকিয়ে দেখি। মা নির্বিকার। মা'র চোখে মুখে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। একই ভাব বিরাজমান। উপরন্তু মা হেসে হেসে তাঁর উত্তেজিত ভক্তদের অনুরোধ করে বলছেন, 'তোমরা কিন্তু ওঁকে কিছুই বলতে পারবে না। সর্বরূপে ভ একমাত্র তিনিই আছেন। এও যে তাঁরই এক রূপ।' সেই অবস্থায় মায়ের আনন্দঘন মূর্তি দেখে আর তাঁর মুখনিঃসৃত ধীর শান্ত কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল। ভাবলাম এ ত সহজ ব্যাপার নয়। বড় বড় ভাল ভাল কথা অনেক সময় বলা যায়। কিন্তু মনে যদি অভিমান থাকে তবে সে অপরের নিকট হতে অপমানকর কথা ও ব্যবহার সহ্য করতে পারবে না। আর এখানে দেখছি মা সাধুবেশ-

ধারী একজন সাধারণ লোকের অপমানজনক কথাও হাসিমুখে নির্বিকারভাবে সহ্য করছেন। মাকে শুধু ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নয় পাশ্চাত্য দেশেরও অসংখ্য জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। মা ইচ্ছা করলে ঐ সাধুবেশধারী লোকটিকে অনায়াসে অপমান করে বিতাড়িত করতে পারতেন। কিন্তু মা'র পক্ষে তা করা একেবারেই অসম্ভব দেখলাম। তখনকার মায়ের ঐ ভাবমূর্তি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হলো। হৃদয়ঙ্গম করলাম মা সত্যই সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেছেন। মা-ই সত্যস্বরূপ। সেইদিন থেকে আমিও মায়ের ভক্ত হয়ে পড়লাম।'

মাও একদিন অবধূতজীকে সূক্ষ্মে দর্শন করে গুরুপ্রিয়াদেবীকে বলছিলেন,—'দেখছিলাম যে অবধূতজী এই শরীরটার ডানহাতটি ধরে খুব কাঁদছে। এই শরীরটা বলছে, তুমি সন্ন্যাসী, ত্যাগী তুমি কাঁদবে কেন?'

এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে হাতটা সরিয়ে নেওয়া হলো। হাতের স্পর্শ টা এমনই স্পষ্ট যে এখনও যেন অনুভব করা যাচ্ছে। প্রত্যুত্তরে অবধূতজী বলছেন,—না-না, আমি কিছুই না।

বিনয়ের ভাবেই কথাগুলি বলছেন। পরমানন্দও সেখানে দাঁড়িয়ে। পরমানন্দ অবধূতজীর ঐ ভাব লক্ষ্য করছে। কিন্তু তার কোনরকম অস্বাভাবিক ভাব আসছে না।

শ্রীশ্রীমা তখন কাশীতে। আশ্রমের হলঘরে রাস হচ্ছে। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে মা বসে আছেন। কৃষ্ণানন্দ অবধূতজীও আছেন। বেলা তখন এগারোটা। হন্তদন্ত হয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত সন্ন্যাসী-প্রবর শঙ্কর ভারতীজী। তিনি কাশীতেই ললিতাঘাটের উপর একটি মঠে একান্তে বাস করেন। মা জগদম্বার আদেশ ছাড়া কিছু আহার করেন না, কোথাও যান না। সকলেই জানে।

তাই তো আনন্দময়ী মা ও অবধূতজী ব্যস্ত হয়ে উঠে এলেন। এবং ভিড় এড়াবার জন্য ভারতীজীকে নিয়ে ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় এসে বসলেন। তিনি মাকে দর্শন করবার জন্য সারাপথ হেঁটেই এসেছেন। মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন এবং বিদায় চাইলেন। মা হেসে হেসে বললেন,—পিতাজী যাওয়া আসা কি আছে ?

ভারতীজীও মৃদুকণ্ঠে বললেন,—'হ্যাঁ সে ত ঠিক কথাই।' তারপর আনন্দিত চিত্তে মঠে ফিরে গেলেন। তিনি হঠাৎ কেনই বা এলেন আবার কেনই বা ফিরে গেলেন। এই কথা জিজ্ঞেস করলে ভারতীজী বলেছিলেন, আমাকে জগদম্বা আদেশ দিলেন, তুই কাল বেলা বারোটার পূর্বে মাতাজীকে দর্শন করবি। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম বৃষ্টি হলে আর কি করে যাবো ?

জগদম্বা বললেন, 'বৃষ্টি রৌদ্র কিছুই হবে না। তুই যাবি।' বাস্তবিক রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই ছিল না। হেঁটে যেতেও কোন কষ্ট হয়নি। বেশ আনন্দেই হেঁটে গিয়ে আবার চলে এলাম।

এই প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, আশ্রমে আসবার পূর্ব দিন ভারতীজীকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন। ত্যাগী পণ্ডিত সন্ন্যাসী-প্রবর শ্রীশঙ্কর ভারতীজীও এইভাবে অলৌকিক দর্শন করে আনন্দময়ী মা'র ভক্ত হয়ে পড়েন। সবই মায়ের লীলা। ভারতবর্ষের কত শত শত জ্ঞানী গুণী ত্যাগী যোগী সন্ন্যাসী যে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়ছেন, মায়ের সাহচর্যে এসে নানা অলৌকিক দর্শন করে বিস্মিত অভিভূত ও মুগ্ধ হচ্ছেন কে তার হিসাব রাখে ? আর মায়ের সেই অপার লীলামাহাত্ম্যের কতটুকুই বা প্রকাশ হয় বা হচ্ছে ?

যোগীবর ত্রিবেণী পুরীজীও একদিন হাসতে হাসতে মায়ের ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—'তোমরা এখনও মাকে

অবতার জ্ঞানে অবতারদের মধ্যেই দেখছো। মা আরও উচ্চে। আরও অনেক-অনেক আগে— ।'

শ্রীধাম বৃন্দাবনে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীহরিবাবাও একদিন আনন্দময়ী মা'র গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।'

ঠিক সে সময় মাও এক অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর হয়েছিলেন। একমাত্র মহাপ্রভুর রাধা ভাবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শ্যামসুন্দরের লীলামৃত পানে মুগ্ধা শ্রীরাধারাণী যেন। কৃষ্ণনাম আশ্রয় করে তাঁর মন মধুর রসময় ধামে প্রবেশ করে কেবল মধুর রসই পান করছে। এই নামাশ্রয় ভিন্ন অন্য আশ্রয় যেন নাই! বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন রসরাজ শ্যামসুন্দর আর একমাত্র শ্রীরাধারাণীই যে এই ভাবের অধিকারী।

শ্রীশ্রীহরিবাবার ভক্ত ললিতাপ্রসাদজী সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন হরিবাবার শিষ্য ভক্ত মনোহরকে, ঠিক ঐ সময় (যখন হরিবাবা মায়ের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন) মাকে মহাপ্রভু হতে অভিন্নরূপে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আনন্দময়ী মা নন যেন স্বয়ং মহাপ্রভু আমার চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। কি সে ভাব! এই প্রসঙ্গে মাও বলেছিলেন, 'বাবা, ঐভাবে এই শরীরটাকে মালা দেওয়ার পর এই শরীরের ভাবটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল।'

যোগীভাই (সোলনের রাজা সাহেব) একবার দেখেছিলেন যে বিন্ধ্যবাসিনীদেবী এবং মা অভিন্ন। জাগ্রত অবস্থায় জপ করতে করতে তিনি দেখলেন আনন্দময়ী মাকে বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর মূর্তিতে। আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই মা নিজ স্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি মা'র গলায় যে মালা পরিয়েছিলেন তা দেখলেন দেবীমূর্তির গলায় ঝুলছে। আবার দেবীর গলায় মালা দিয়ে

দেখলেন সে মালা মা'র গলায় শোভা পাচ্ছে। যোগীভাই বিস্মিত অভিভূত ও হতবাক হলেন মায়ের এই লীলাখেলা নয়নগোচর করে। স্বপ্ন নয় কল্পনাও নয়। জাগ্রত অবস্থায় সবকিছু দেখছেন আর চোখের জলে ভাসছেন।

ফরাসী মহিলা মিরিয়ম ওর মাকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছেন সমুদ্র পার থেকে ভারতে। প্যারীতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চায় নিযুক্ত। শুধুমাত্র মায়ের ছবি দেখেই অভিভূত হয়েছিলেন। অনেক অলৌকিক দর্শনও হয়েছে। মা তখন পুরীর পথে মুরীতে অবস্থান করছেন। কলকাতা পৌঁছেই মিরিয়ম ওর রাঁচীতে টেলিগ্রাম করলেন। কারণ মা রাঁচী থেকেই যাত্রা করেছিলেন পুরীর পথে। ওঁর পিতামাতা ইহুদী, পতি ছিলেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইটালিয়ান। অবশেষে পুরী স্টেশনেই শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে দেখা হলো মিরিয়ম ওরের। প্রথম দর্শনেই আবেগে অধীর হলেন। মা'র হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। ভারতীয় ভাষা তিনি জানেন না। তাই ভাষাহীন হৃদয়ের গভীর ভাবটিকে তিনি যে কীভাবে প্রকাশ করবেন তার পথ যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মায়ের বস্ত্রাঞ্চলটুকুও হাতে নিয়ে বার বার চুম্বন করতে লাগলেন। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করলেন। কি সে ভাব! মায়ের ভক্তবৃন্দ ও স্টেশনের উপস্থিত লোকেরা সে দৃশ্য দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। ভক্ত ও ভগবানের লীলা ত দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে না। সর্বভূত যাঁর অন্তঃস্থ এবং যাঁর দ্বারা সমস্তই পরিব্যাপ্ত তিনি অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য। প্রাণের অনুরাগ দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। সেই ভক্তিরূপ প্রসূন প্রস্ফুটিত হলে, মেঘের উদয় হলে ভক্তি-বারি বর্ষণ ত হবেই।

মিরিয়ম ওর মায়ের ভক্ত আত্মানন্দের বন্ধু। আত্মানন্দ (মিস ব্ল্যাঙ্কার) ইউরোপে প্রথম ওঁকে মায়ের কথা বলেন। তারপর মায়ের ছবি দেখেই অভিভূত হয়ে যান। মাকে দেখবার জন্য আকুল হয় মন প্রাণ। কিসের এক আকর্ষণ অনুভব করেন। কেন এমন হয় বলতে পারেন না। অবশেষে মাকে চাক্ষুষ দেখে ভাবাবেগের বন্যায় ভেসে যেতে লাগলেন। আত্মানন্দও বিদেশিনী মহিলা। নাম হলো মিস ব্ল্যাঙ্কার। মা-ই আত্মানন্দ নাম রেখেছেন। তিনিও একদিন মাকে দর্শন করে অভিভূত হয়ে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েন। বর্তমানে আশ্রমবাসিনী।

এইভাবে লীলাময়ী মা ভক্তসনে লীলা করে পুরীধামের পথে যাত্রা করলেন। মিরিয়ম ওরও সঙ্গে রইলেন। মা ত কারো একার মা নন। আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ মা নন। মা যে বিশ্বজননী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। তাই তো বিশ্বের দিক দিয়ে দেখলে সমগ্র ভূতের অন্তরে ঈশ্বরস্বরূপ অক্ষর অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সকলের অসঙ্গ আত্মস্বরূপ ত মা-ই। মা-ই নিজেকে বহু করে বিস্তৃত হয়ে রয়েছেন। মা-ই উপাদান। মা-ই নিমিত্ত। তিনি বিশ্বমূর্তি ধারণ করে জীবের সাধনা মত ভোগ সম্পাদন করিয়ে নিচ্ছেন। আবার মুক্তিকামী পুরুষকে তাঁর অন্তরে পরমাত্মস্বরূপ সংস্থানে চিরদিনের জন্য মিলিয়ে নিচ্ছেন। অন্তর্বাহ্য সকল শক্তিপ্রবাহ যে তাঁরই শক্তির গতি। তিনিই পরা গতিরূপে জীবকে বরণ করে, তার অপরা গতিকে সংহরণ করছেন। তিনিই যে পরমাগতি। সকলের একমাত্র আশ্রয়। তিনিই আত্মার আত্মা। পরমাত্মা। পরম ধাম। তাই তো তিনি প্রীতির সাগরস্বরূপ। মহাসাগর। তাই তো দেখা যায় সাধারণ জীব সেই প্রেমের মহাসমুদ্রের তীরে এসে কূলকিনারা দেখতে না পেয়ে ভাবানন্দে বিভোর হয়ে যায়। অভিভূত হয়ে পড়ে। নিজের সত্ত্বাকেও হারিয়ে ফেলে। ক্ষণিকের জন্য প্রেমস্বরূপ রসস্বরূপের রসরূপে সে একীভূত হয়ে যায়। তখন

অহেতুক ভক্তিপ্রবাহের তরঙ্গে স্নাত হয়ে আত্মময়—মা-ময় হয়ে যায়।

*　　　　*　　　　*

ওমা কোথায় যাও ?

শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞেস করছেন একজন অপরিচিতা মহিলাকে। পুরী যাওয়ার পথে। ভক্তবৃন্দসহ খড়্গপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন গাড়ির জন্য। মা প্ল্যাটফরমে পায়চারি করছেন। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো একটি মধ্যবয়স্কা মহিলার দিকে। ছোট একটি ছেলের হাত ধরে আপন মনে চলেছে। কোনদিকে খেয়াল নেই। কে যেন কাকে ডাকছে। কিন্তু আবার ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর। 'ওমা কোথায় যাও ?' এবারে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। মা'র দিকে তাকালো। অবাক-বিস্ময়ে। তাকে ডাকছেন কেন ? মা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন একে একে সবকিছু। সেও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, তার স্বামী খুবই অসুস্থ। মরণাপন্ন। মেদিনীপুরের এক গ্রামের বাসিন্দা। শহরের ডাক্তারবাবু বলেছেন এক্সরে করতে হবে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু সে গরীব। এমন পয়সা নেই যে কলকাতায় নিয়ে যায় বা এক্সরে করিয়ে চিকিৎসা করে। তাই সে চিন্তিত। কিছুই ভেবে পাচ্ছে না কি করবে।

ডাক্তার মৈত্র কাছেই ছিলেন। মা এবারে জিজ্ঞেস করলেন 'বাবা! কি করা যায় ?' ডাঃ মৈত্র কলকাতার এক সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার। সুতরাং ডাঃ মৈত্র নাম ঠিকানা লিখে স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়ে বললেন সে যেন কলকাতায় গিয়ে হাসপাতালে ওঁর সঙ্গে দেখা করে। এক্সরে ইত্যাদি সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন।

স্ত্রীলোকটি বললো, মা, কলকাতায় স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার পয়সা ত আমার নেই।

মা বললেন ডাঃ মৈত্রকে, বাবা! এখান থেকে কত খরচা লাগে?

তারপর জিজ্ঞেস করলেন পানু ব্রহ্মচারীকে, কিছু আছে নাকি?

পানুদা, ডাঃ অনিল মৈত্র, চিত্রাদি ও আরও অনেকে কিছু কিছু করে দিলেন। স্ত্রীলোকটির স্বামীর চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই এই ভাবে মা করে দিলেন। অযাচিতভাবে এই সাহায্য পেয়ে দুঃস্থা স্ত্রীলোকটি বিস্মিত অভিভূত ও হতবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তখন তার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। সে চেনে না, জানে না, আনন্দময়ী মা কে। কিন্তু সে চিনলো জানলো করুণাময়ী এক মাকে। যিনি দুঃখিনী সন্তানকে কৃপা করতে কখনও ভুলে যান না। যিনি করুণাময়ী তিনিই যে আনন্দময়ী মা।

আনন্দময়ীর হাসি, স্বর্গ হতে স্বর্গে ভাসি,
বিশ্বভরা দুঃখ রাশি হর্ষে করে পুষ্পহার।

পনেরো

হে ভগবান, হে ভগবান·········

···অচ্যুতম কেশবম্····· ·······।

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে সুস্বর কণ্ঠে মা গান করছেন। সেই অনুরাগ মত্ত অন্তরের আর্তস্পন্দন সন্ন্যাসী যোগী ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাদের অন্তরেব সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ভেঙেচুরে তাদের নিজস্ব চেতনাবোধকে নিভিয়ে দিয়ে, এক মহান বিরাট সত্তার মধ্যে প্রবেশেব জন্য যেন উতলা করে তুললো। তারা যেন সেই মহান আত্মারই সহোদর। বিশ্বকে ছেয়ে আছে যে সত্তা সেই সুবিশাল বিরাট সত্তাকে অনুভব করলো তাদেরই অন্তরে। সেই পরমানন্দের অনুভূতি লাভ হলো। আনন্দ আনন্দ···ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার······।

মা আছেন সপ্তর্ষি আশ্রমে। হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে হৃষিকেশের পথে এই আশ্রম। সপ্ত সরোবর অতি নিকটেই। গঙ্গা অদূরে প্রবাহিতা। পুরাকালে এইখানেই ছিল বিশ্বমিত্রাদি সপ্তঋষির আশ্রম। ঋষিদের তপোভূমি। স্থানটি মনোরম। আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ। এমনই এক অনির্বচনীয় পরিবেশের মধ্যে আনন্দময়ী মা গান করছেন। সুন্দর এক অতিথিশালায় শ্রীশ্রীমা রয়েছেন। দুই পাশের কুঠিয়াতে এবং তাঁবুতে রয়েছেন ভক্তবৃন্দ। বহু সাধু মহাত্মারাও এসেছেন। তাঁদেরও থাকবার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। সংযম সপ্তাহের মহাব্রত পালন উপলক্ষেই এই আয়োজন। কর্মযোগী গোস্বামী শ্রীগণেশ দত্তজীই সব আয়োজন করেছেন। লোকসেবা এবং সমাজকল্যাণই তাঁর জীবনব্রত। সিমলাতে প্রথম মাকে দর্শন কবেই অভিভূত হয়ে পড়েন। তারপর

থেকেই ওঁর একান্ত ইচ্ছা হয় মাকে আশ্রমে আনবার জন্য। ভক্ত-প্রবর রায়বাহাদুর নারায়ণ দাশজীও ওঁকে এই ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেন।

আশ্রমের ঠিক মধ্যভাগে মহাদেবের মন্দির। তার চতুঃপার্শ্বে অলিন্দে সপ্তঋষিদের প্রস্তরমূর্তি সজ্জিত। আর একদিকে পণ্ডিত মালব্যজীর বিশাল প্রস্তরমূর্তি। তারই পিছনে বিরাট সৎসঙ্গ ভবন। হলের মধ্যে পরমহংস রামতীর্থ মহারাজের দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্তি।

সৎসঙ্গ ভবনটি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। হলের ভিতরে পূর্বদিকে চৌকির উপর সাধু মহাত্মাদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। মধ্যভাগে ব্যাসাসন এবং অপর পার্শ্বে শ্রীশ্রীমায়ের বসবার আসন। সম্মুখভাগে কীর্তনীয়া ও আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের বসবার স্থান। অবশিষ্ট স্থানে স্ত্রী-পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সৎসঙ্গ মহাব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এসেছেন শ্রীশ্রীহরিবাবা, কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, যোগেশ ব্রহ্মচারী, বম্বের কৃষ্ণানন্দজী, যোগীভাই, টিহরীর মহারাজা-মহারাণী, অম্বের রাজাসাহেব আরও অনেকে।

সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৩টে থেকে ৪টে পর্যন্ত সমবেত ধ্যান ও জপের সময় রাখা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে ১২॥০ পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৪টে থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ চলছে। সংযম সপ্তাহের চতুর্থ দিনে ঋষিকেশ পরমার্থ নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শুকদেবানন্দজী বক্তব্য রাখলেন রামায়ণের উপর। এবং শ্রীশ্রীমা'র ওখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। ভাষণ দিলেন বম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, যোগেশ ব্রহ্মচারীজী, কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী। গোস্বামী গণেশ দত্তজী বললেন সংযম সপ্তাহ মহাব্রত উপলক্ষে। সুললিতকণ্ঠে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়।

একটি সূক্ষ্ম দর্শনের ঘটনার কথা বললেন শ্রীশ্রীমা। তখন রাত্রি দুইটা হবে। এমন সময় একজন সূক্ষ্ম শরীরধারী তেজস্বী বলিষ্ঠ

শ্বেতবস্ত্রধারী দীর্ঘকায় মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন মা'র নিকট। তাঁর পিছনে দুইজন শিষ্যও ছিলেন। তাঁরা এসে মাকে প্রণাম করলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মা'র মুখ হতে 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ়মতে' শ্লোকটি নিঃসৃত হতে লাগলো। অকস্মাৎ ঐ সূক্ষ্ম শরীরধারী গুরু ও শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে বস্ত্র ও মনের ভাবের, সবরকমেরই পরিবর্তন দেখা যেতে লাগলো। তাঁদের যেন ঊর্ধ্বগতি হয়ে গেল। মাকে দর্শন করেই তাঁরা যেন মুক্ত হয়ে গেলেন। এই অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে বিস্মিত হলেন উপস্থিত মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দ। মা'র অলৌকিক কৃপাবর্ষণ যে কখন কার উপর হচ্ছে কে তার খবর রাখে ?

রাত্রি ৯টার পর মাতৃসঙ্গ হয়। কখনও মা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আবার কোনদিন ভাবানন্দে বিভোর হয়ে নামগান করছেন। কি সে ভাব! কি সে সুর!

এক প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন, 'ভগবানের সব নামেই শক্তি আছে। তুমি যে নামই নেও না কেন। সেই নামের দ্বারাই তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পার। বেগের কথা, গতির কথা, সেটা নির্ভর করে সাধকের সাধনার ইচ্ছার তীব্রতার উপর। যদি তীব্র সাধনা হয় তবে শীঘ্র পৌছানো যায় লক্ষ্যে। আর যদি গতি ধীর হয়, তবে পৌছুতে দেরী হয়।

এইভাবে আনন্দময়ী মা হরিদ্বার সপ্তর্ষি আশ্রমে সাধু মহাত্মাদের মধ্যে লীলা করে যাত্রা করলেন দিল্লীর পথে। পথে মোদীনগরে ভক্ত ব্যবসায়ী শ্রীযুত মোদীর ভবনে (সৎসঙ্গ ভবনে) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। শ্রীযুত মোদী হরিদ্বারে দুদিন এসে মাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন মা তাঁর গৃহে পদধূলি দিলে খুবই আনন্দিত হবেন। মা মোদীনগরের বাসিন্দাদের মাতিয়ে নামানন্দে বিভোর করে দিল্লী এসে পৌছলেন। আবার দিল্লী মেতে উঠলো নেচে উঠলো মাতৃনামের আনন্দে। দিল্লী থেকে বৃন্দাবন হয়ে

যাত্রা করলেন কাশীধামের পথে। কাশী থেকে আবার হঠাৎ চলে এলেন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। এই বিন্ধ্যাচল আশ্রমের নির্জনতায় মা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তাও বা ক'দিন! বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত হয়ে প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে আশ্রমটি যেন শান্তির কোলে শুয়ে আছে। আশ্রম হতেই দেখা যায় দূরে ধীর মন্থর গতিতে গঙ্গা আপন মনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শান্ত জলপ্রবাহ শান্তি-প্রবাহিনী। যেন শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে চলেছে দুঃখী তাপী মানুষের জন্য। তাব উভয় পার্শ্বের দিগন্তবিস্তৃত নির্জন প্রান্তরে যে মৌন গম্ভীরতা আছে, তার প্রশান্তি হৃদয় মনকেও স্পর্শ করে। চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা নির্জনতা পাখীদের ডাক এবং সুদীর্ঘ অবসর কারণ এখানে ভক্তদের আনাগোনা ভীড় কম, সোনালী রৌদ্রে ভরা দুপুর, ফুলের সৌরভ আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজ হিল্লোলে মা'র মনকেও করে তোলে উদাস। আরও এখানে গঙ্গার রূপ যে গৈরিক!

*   *   *

'তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পাবে।' গান করছেন শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়। সুমধুব স্বরে। একই গান নানা ভাবে নানা ছন্দে নানা সুরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গাইলেন। অপূর্ব ভাব! মধুর সে সুর!

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে ভক্ত দিলীপকুমারের গান শুনছেন। পুণাতে। গণেশ খিন্দ রোডে শ্রীযুত ভুতা সাহেবের বাড়ীর সন্নিকটে একটি বড় বটগাছের নীচে মোটর গ্যারেজে মা অবস্থান করছেন। ঘরটি সুন্দরভাবে রং করে সাজানো হয়েছে, দুইদিকে দুটি জানলা করে পরদাও দেওয়া হয়েছে। গ্যারেজ বলে আর মনে হয় না। পাশেই রান্নাঘর ও বাথরুম।

দিলীপকুমার কয়েকজন ভক্ত শিষ্য ও ইন্দিরাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মাকে দেখতে। পরিধানে গৈরিক বসন। মাথায়

পীত রংয়ের টুপী। কপালে তিলক। গায়ে সিল্কের নামাবলী। সৌম্য প্রসন্নমূর্তি।, ইন্দিরাদেবীর পরিধানেও পীত রংয়ের শাড়ী। মুখে হাসি লেগেই আছে। উভয়েই মাথা লুটিয়ে মাকে প্রণাম করলেন।

দিলীপকুমার মা'র সঙ্গে ইন্দিরাদেবীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, মা, ইনি আপনার ডেরাছুনের ভক্ত কৃপারামজীর কন্যা। আমার এখানেই থাকেন। প্রকৃত নাম জনককুমারী। আমিই নাম রেখেছি ইন্দিরা।

তারপর নানা কথার পর মা হেসে হেসে বললেন, বাবা, তোমার এমন সুন্দর গলা, আমাদের একটু গান শোনাবে না ?

মা, আজকাল বিগ্রহের সম্মুখে ছাড়া বিশেষ কোথাও গান করি না। বলেই আবার ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলে ভজন সুরু করলেন। কারণ মায়ের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না ভক্ত দিলীপকুমাব। প্রথমে গুরুপ্রণাম করে নির্বাণাষ্টক স্তোত্র ও ভবান্যাষ্টক স্তব অতি সুললিত কণ্ঠে শোনালেন। তারপর সুরু হলো ভজন। কীর্তন।

ভক্ত দিলীপকুমারের গান শুনে মুগ্ধ হলেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

মা'র নির্দেশমত নারায়ণ স্বামীজী তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করছেন। গত দুই তিন দিন ধরে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মলীলা পাঠ হচ্ছে।

মা বোধ হয় সেই কথাই খেয়াল করে বলছেন, 'রামচন্দ্রের জন্ম হ'ল। তোমরা এখানে অখণ্ড রামায়ণ-পাঠও লাগিয়ে দিতে পার। ডেরাছুনের লক্ষ্মীজী ছিলেন নিকটেই। তিনি খুব উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন, মা, কবে থেকে সুরু হবে ?

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যো কাল কবো সো আজ করো, আউর যো আজ করোগে সো অভী করো।

একটু পরেই মা আবার বললেন, যদি সম্ভব হয় তবে এই ১২টা থেকেই আরম্ভ করো না।

তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। কে আরম্ভ করবে কথা হওয়ায় নারায়ণ স্বামী বললেন, তিনি তখনও কিছু খাননি। মা'র অনুমতি হলে আরম্ভ করতে পারেন।

মা বললেন, বেশ ত। নারায়ণ আরম্ভ করে দিক। তারপর তোমরা সকলে মিলে ভাল করে পাঠ কর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেল। পাঠের স্থান ঠিক হলো। কে কে পাঠ করবে তাও স্থির হলো। নারায়ণ স্বামী বিধিমত ভোগ আরতি করে অখণ্ড রামায়ণ পাঠ সুরু করলেন।

আনন্দময়ী মা'র আগমনে পুণা শহর প্লাবিত হয়ে উঠলো। অখণ্ড রামায়ণ পাঠ, ভজন, কীর্তন, কৃষ্ণগুণগান, সৎসঙ্গ ধর্মালোচনায়। সাধারণ অসাধারণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্ত্রী-পুরুষ যুবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই মাতৃদর্শনে এসে ভগবৎভাবে বিভোর হতে লাগলেন। এমনই এক অনির্বচনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ভক্তপ্রাণ দিলীপকুমার বললেন, 'শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনেছিলাম যে সাধন-ভজন করে উচ্চ স্তর লাভ করে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আনন্দলাভ করে থাকেন। কিন্তু সেই আনন্দ অপরকে দিতে পারেন না। সেই শান্তি অপরের মনে স্ফুরিত করতে পারেন না। যাঁরা পারেন তাঁরা এ জগতে দুর্লভ। তাঁরাই অতিমানব। এই জাতীয় অতিমানবদের মধ্যে আনন্দময়ী মা অন্যতমা।'

* * *

নদীর কল্লোল, সাগর হিল্লোল গাহে মায়ের যশোগান
বিশ্ব-দুঃখে হইয়া কাতরা এসেছেন নেমে ভব দুঃখ-হরা.
বরষি স্নিগ্ধ করুণার ধারা করিবেন জীবে পরিত্রাণ
গাও আনন্দময়ীর জয় হয়ে সব একতান।

দুই-ই এক। হওয়া আর করা একই স্বরূপতঃ। আর স্বরূপ থেকে পৃথক মানলে সেখানে পৃথকই। স্বরূপতঃ যিনি করছেন, তিনিই হচ্ছেন। স্বরূপ থেকে পৃথক বললে, সেখানে ইচ্ছাশক্তি। মহাশক্তি আর ইচ্ছাশক্তি। এইজন্য জগৎ জীবের পক্ষে যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা করতে পারা হয়, তাই দিয়েই মূলটাকে ধরা। মূল ধরা হওয়া আর করা একই কিন্তু। দুই ভেবে সকলে কর্ম কর। কিন্তু আপনা আপ। দ্বিতীয় সেখানে কে? ঐ প্রকাশের জন্যই স্বক্রিয়া।

বলছেন শ্রীশ্রীমা। ডেরাডুনে। কিষণপুর আশ্রমে। অসুস্থ হয়ে সম্প্রতি মা এখানেই আছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরাও আসছেন। কাশী থেকে ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজও এসেছেন। ভক্তিমতী রমণী মায়েব স্নেহধন্যা শোভাদির আগ্রহে অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত অগ্নিসত্তা শাস্ত্রী, মন্ত্রাচার্য বাটুদা সম্পুটিত শত চণ্ডীপাঠ ও মহামৃত্যুঞ্জয় অনুষ্ঠান সুরু করেছেন। মা'র শরীর শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুক ভক্তবৃন্দের একমাত্র এই প্রার্থনা। কামনা।

এই অসুস্থতার মধ্যে মা ভক্তপ্রাণ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা করে আনন্দলাভ করছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত ও গুরুপ্রিয়াদেবীও আছেন।

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করছেন, এমন কোনও স্থিতি আছে, যেখানে প্রকাশেরও কোন শব্দ নেই?

শান্ত ধীরকণ্ঠে মা বলছেন, শব্দ অশব্দের কথাই নেই। ভাষা মানলে শব্দ একদিকের কথা। পূর্ণ হয়েও অপূর্ণ। অপূর্ণ হয়েও

পূর্ণ। কারণ পূর্ণই ত আছে। অনন্তই ত আছে। এইজন্য সকলেরই নিজ নিজ স্থান বেছে নেওয়া।

আবার বলছেন, আমার স্থানেই আমি দাঁড়িয়ে, অপর আমি কিন্তু না। এই ঢংএ চলে। চলতে চলতে যাত্রী মিলে যায়। আবার কখনও যাত্রী পাওয়াও যায় না। তবে লক্ষ্য ঠিক থাকলে ধোঁকা খাওয়া আর হয় না। এইজন্য বলা হয় যে গ্রন্থিরূপে-পথরূপে একমাত্র তিনিই। 'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' তাহলে আর কোথাও কোনরকম বিরোধ নেই। দুনিয়ার কথা ত্যাজ্য বলা হয়, কিন্তু এমন স্থান আছে যেখানে ত্যাজ্য গ্রাহ্য নেই। ঐ-ই। বিশেষরূপেও ঐ-ই। জাগ্রত-অজাগ্রত, জানা-অজানা, প্রকাশ-অপ্রকাশ এই সবের কোনও প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। জাগতিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। প্রশ্ন আসে সমাধানের জন্যই। এইজন্য বিশেষ আর অবিশেষ এর স্থান থেকে আলাদা না।

দেহ মানে কি? দেও দেও। ভোগ প্রাপ্তি। নিজকে নিয়েই কিন্তু ভোগ। বাবা, একটা কথা আছে—আবার আপনত্ব বোধ না থাকলে ভোগ হতে পারে না। আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার শত্রু, আমার মিত্র আমি এই অবলম্বনেই প্রাণের গতি। সাধকের ক্ষেত্রে ত প্রাপ্তি অবলম্বন। তার সর্বদা স্থিতি থাকে ত, তাই চলবার সময় পথের আর খেয়াল থাকে না। লক্ষ্যে একবার যদি পৌঁছাতে পারে তখন সে পথের কথা বলতে পারে। তখন এক আলোতেই সব-কিছু উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। পথ লক্ষ্য যাই বল নিজ ভিন্ন ত আর কিছুই না।

আবার ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজকে মা বললেন, আচ্ছা বাবা, যাদের মৃত্যু হয়েছে আর যারা মুক্ত, তাদের পক্ষে কি নিজেদের পরিচিত দেহ ধারণ করে দেখা দেওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ মা, পারেন। বললেন কবিরাজ মহাশয়।

আবার জিজ্ঞেস করছেন মা, আচ্ছা বাবা, নির্বাণ যেখানে সেখানে করুণার কথা আসতে পারে কি ?

—যেখানে করুণার কথা হচ্ছে সেখানে দুঃখ বলে দ্বিতীয় কথাও থাকে।

—তাহলে নির্বাণে কি করুণা করা বাধক হচ্ছে ?

—মা, দুটি মতই আছে। ইহা বৌদ্ধধর্মের মত। একমতে নির্বাণ হলে আর করুণা করা যায় না। অপর মতটিকে নির্বাণ-লাভের পরেও স্বরূপভূত করুণা থাকে। যেমন বিষয় না পেলেও আনন্দ, যাকে বলে স্বরূপানন্দ। এইটাই হচ্ছে বুদ্ধত্ব।

—বাবা, যেখানে বুদ্ধত্ব বলছো, সেখানে ত নির্বাণ থেকেও করুণা চলে। যেমন, আগুন থেকে যতই তার তাপ নেও না কেন, তার দাহিকাশক্তি কিন্তু কম হয় না। ভগবান যাকে তোমরা পূর্ণ বলে মান, সেখানে ত কিছুই ক্ষুণ্ণ হবার নেই। নিজেই নিজের অধীন স্বাধীন।

—মা, আর একটি কথা। একটা হচ্ছে করুণা আর একটা স্বাভাবিক করুণা যেমন সূর্যের প্রকাশ, আর ঐ শূন্য হতে কিরণ-ধারার প্রবাহ। এই দুটির মধ্যে কি প্রভেদ আছে, না উভয়ই এক ? বললেন গোপীনাথ কবিরাজ।

শ্রীশ্রীমা ও কবিরাজ মহাশয়ের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর তাত্ত্বিক আলোচনা শুনে গুরুপ্রিয়াদেবী ও বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হলেন। কঠিন তত্ত্বকথা সহজ করে সরলভাবেই আলোচনা করলেন।

গোপাল ভাল আছে ত ? মা জিজ্ঞেস করছেন সাবিত্রীদিকে। সাবিত্রীদি আজই কাশী থেকে এসেছেন। গোপাল মানে কাশীর গোপালজী। গোপাল বিগ্রহ। ইতিপূর্বে অবশ্য গোপালজীর অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। মাও কিছু কিছু প্রকাশ করেছেন।

সাবিত্রীদি অবাক বিস্ময়ে ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ভালই ত দেখলাম।

মা কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আস্তে আস্তে গুরুপ্রিয়া-দেবীকে বললেন, 'কাল রাত্রেই আমি বুনিকে* বলেছি যে গোপাল এসে তাঁর ছোট্ট লাল টুকটুকে হাতখানি এই শরীরকে বার বার দেখাচ্ছেন। বেশ চোট পেয়েছেন এই ভাবটা।' জন্মাষ্টমীর তিন চার দিন পূর্বেই অবশ্য মা কাশীতে অতুল ব্রহ্মচারী ও ভাই যতুনাথ ভট্টাচার্যকে (মাখন) পত্র দ্বারা জানিয়েছিলেন, জন্মাষ্টমীর দিন গোপালজীকে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া কবা হয়।

গুরুপ্রিয়াদেবী বললেন, তোমার কাছে এসে বেশ নালিশ করে গেল ত ?

মা হেসে হেসে বললেন, না, ঠিক নালিশ না। তবে ব্যথা লেগেছে তাই এই শরীরটাকে জানিয়ে গেল।

পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল গোপাল বিগ্রহ সত্যই চোট পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন, অনেকেই বলে পাথরের মূর্তি কি আবার জীবন্ত হতে পারে ? মূর্তিপূজায় তাই অনেকেরই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। কিন্তু আনন্দময়ী মা করুণা করে নানাভাবে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে আমাদের জ্ঞানেব বাইরেও বহু কিছু আছে। অনেক ঘটনা ঘটে যা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মা'র শরীরের সুস্থতাব জন্য ভক্তবৃন্দ সকলেই চিন্তিত। সকলেই মার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, মা, আপনি শরীরটাকে সুস্থ করে তুলুন। যোগীভাইও মাকে বললেন, মা, খেয়াল করে শরীরটাকে সুস্থ করে তুলুন। আপনার চরণে মিনতি করা ভিন্ন আমাদের ত আর কোন ক্ষমতা নেই।

*বুনি—ভাল নাম বীথিকা। এলাহাবাদের পুরাতন ভক্ত শ্রীনীরজনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ভক্তপ্রবর বিনুদার (শ্রীশরদিন্দু নিয়োগী) মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করবার ইচ্ছা জাগে এবং মহামৃত্যুঞ্জয় জপের আয়োজনও করলেন। বিনুদা বলছেন তাঁর মনে ঐরূপ সঙ্কল্প ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মা তাঁর দিকে একবার চাইলেন। তাতেই ওঁর মনে দৃঢ়বিশ্বাস হলো যে এই অনুষ্ঠান যে ভাবেই হোক সম্পন্ন করতেই হবে।

* * *

দিল্লীর গান্ধী ময়দানে গীতাজয়ন্তী উৎসব চলছে। সেই উপলক্ষে মা এসেছেন দিল্লীতে। দিল্লীর ভক্তদেরও একান্ত প্রার্থনা ছিল মা যেন একবার দিল্লীতে আসেন। দিল্লীর আশ্রম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। স্বামী পরমানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে রায়বাহাদুর নারায়ণ দাস, শ্রীযুত প্রেমহরিলাল বর্মা, শ্রীযুত তীর্থরামজী ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তদের সাহায্যে অসম্পূর্ণ আশ্রম গৃহটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। কালকাজীর সন্নিকটে শ্যামনগব গ্রামে এই আশ্রম। শহবের শেষপ্রান্তে নির্জনতার মধ্যে প্রাকৃতিক পবিবেশটি মনোরম।

বিড়লাজীর অনুরোধে মা এলেন বিড়লা মন্দিবে। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো বিড়লা মন্দির। নামগানে কীর্তনানন্দে বিভোর হলো ভক্তবৃন্দ। শ্রীশ্রীহরিবাবা ও অন্যান্য মহাত্মারাও রয়েছেন। মাতৃদর্শনে অসংখ্য লোক সমাগম হলো। মাকে শুধু তারা দেখবে না, প্রণাম করবে আর মায়ের শ্রীমুখের অমৃতনিষ্যন্দ বাণী শুনবে।

মন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রামও মাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে তাঁর স্ত্রী ও তিনি নিজে ফুল মালা ও বস্ত্র দিয়ে পূজা করলেন। সেখান থেকে মা গেলেন দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে। নূতন একটি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই উপলক্ষে। মিশনের সন্ন্যাসীরা ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখালেন। ভাবানন্দময়ী মা তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিভোর। রামকৃষ্ণ মিশনে

লীলা করে মা আবার ফিরে এলেন আশ্রমে। কালকাজীর আশ্রম তখন অখণ্ড নামকীর্তনে মেতে উঠেছে। নূতন হলঘরের নামকরণ হয়েছে 'নাম ব্রহ্ম মন্দির'। একখানি শ্বেতপাথরের উপর মহামন্ত্র লেখা হয়েছে। শ্রীশ্রীহরিবাবা ও অন্যান্য মহাত্মাদেব হাত দিয়ে সেই প্রস্তরলিপির আবরণ উন্মোচন করান হয়েছে। মায়ের ইচ্ছায় রবিবার দিন অখণ্ড মহামন্ত্র নামযজ্ঞ সুরু হলো। ঐ দিনই মন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রাম সস্ত্রীক মাতৃদর্শনে এলেন। মায়ের সঙ্গে একান্তে সাধন ভজন ও ধর্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। জয়পুরের মহারাণীও মা'র সঙ্গে একান্তে ধর্মালোচনা করলেন।

সৎসঙ্গ অখণ্ড নামকীর্তন ও নানা ধর্মালোচনার মধ্য দিয়ে কালকাজীর আনন্দময়ী আশ্রমে এক অনির্বচনীয় পবিবেশের সৃষ্টি হলো। ভক্তকণ্ঠের হরিনামগানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আশ্রম গৃহ মন্দির। প্রতিটি দিনই অসংখ্য ভক্ত সমাগম হতে লাগলো। কয়েকজন বিদেশিনী মহিলাও এসেছেন। আশ্রমবাসিনী বিদেশিনী আত্মানন্দ* তাঁদের সঙ্গে মায়ের কথাবার্তায় সাহায্য কবলেন। মায়ের ভক্ত এখন শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত এবং কৃপাপ্রার্থী।

মা সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাম করছেন। তখন স্বর্গীয় এক ভাবের প্রবাহ মায়ের শরীরকে বিগলিত করে নৃত্যপর করে তুলেছে। কীর্তনের ছন্দে ললিত নৃত্যকলা যেন তাঁর দেহকে অতিক্রম করে লীলায়িত হয়ে চলেছে। সকল রসকে আত্মসাৎ করে উদ্দাম লীলার বুকে যেন আনন্দস্বরূপ—সেই আনন্দমূর্তিমন্ত—শ্রীনিত্যানন্দ রায়।

* 'আত্মানন্দ' বর্তমানে শ্রীশ্রীমায়েরই আশ্রিতা। আশ্রমবাসিনী। অস্ট্রিয়ান মহিলা। প্রকৃত নাম মিস্ ব্লাঙ্কা শ্লাম্।

মা গাইছেন—

নিতাই ডাকে আয়
গৌর ডাকে আয়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু
নদে ভেসে যায়॥

মা বললেন, নাম, নাম কর। নাম নিতে নিতে নামে রুচি হবেই। সংসারে থাক। সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন কর। ধীরে ধীরে বাইরের ভাবগুলি সরে যাবে। যা ছাড়বার তা ছেড়েই যাবে। আর যা কখনও ছাড়ে না, যায় না, তা থেকেই যাবে। সেই জন্যই বলা হয় যে সংসাবে যাদের নিয়ে থাকতে হবে তাদের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে চেষ্টা কব।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন রাষ্ট্রপতি। তিনিও ভক্ত মানুষ। দিল্লীতে মা এসেছেন জেনে তিনিও মাকে তাঁর ভবনে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের মধ্যে মোগল গার্ডেনে মা'র জন্য পৃথক তাঁবুর ব্যবস্থা করলেন। মা রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূজার ঘরেও গেলেন। মা রাষ্ট্রপতি ভবনের ফুলবাগানের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধচিত্তে বললেন, স্থানটি খুবই শান্তিপূর্ণ। বেশ শান্ত জায়গা। পাখীর ডাকও যেন শোনা যায় না। একান্ত বাস হয়ে গেল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ত মাকে দর্শন করেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিছুতেই ছাড়বেন না। ব্যাকুল চিত্তে অনুরোধ কবলেন আবার যেন আসেন এবং ভোগ গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, মা, আপনি আশীর্বাদ করুন ভগবানে যেন ভক্তি থাকে। এইভাবে মা রাষ্ট্রপতি ভবনে লীলা করে আবার ফিরে এলেন আশ্রমে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়াও একদিন এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বললেন, মাতাজীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তাহাই আমার কল্যাণের জন্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিব। তিনি তখন একটি

জটিল মোকদ্দমার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। আবার একদিন মণ্ডীর রাণীসাহেবার সঙ্গে কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ যুবরাজ করণ সিং (বর্তমানে মন্ত্রী) মা'র দর্শনে এলেন। তিনি একান্তে মা'র সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

পাঞ্জাবের গভর্নর শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদজী প্রথম মাকে দর্শন করে মুগ্ধ-চিত্তে বললেন, 'মা, আপনার জন্য কত লোকের এই দুনিয়াতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ হচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এতদিন আমি আপনার দর্শন পাই নাই। আজ আমার মন শান্ত হলো।'

শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীযুত গোপালস্বরূপ পাঠকও মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা বললেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রদূতও মা'র সঙ্গে ধর্মালোচনা করে মুগ্ধ হলেন। মা কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ভক্তবৃন্দদের লক্ষ্য করে বলছেন, আসল সরকারের 'নৌকর' হও। সেই মূল সরকার থেকেই ত সব। যেমন সরকারী কাজ নিয়মিতভাবে কর, সেই রকম এই সরকারের দিকেও একটু চিন্তা রাখা উচিত। সব কাজেই লক্ষ্য থাকবে তিনিই। সেবা-বুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে আর বন্ধনের কারণ হয় না। তবে সেই সেবা-বুদ্ধিতে স্থিত থাকার জন্য যেমন তোমরা ঘড়িতে দিনে একবার করে দম দেও না? সেই রকম আর কি, সকাল সন্ধ্যায় একবার করে দম দেবার চেষ্টা করা। মানে একটু সময় স্থিরভাবে বসে তাঁর ধ্যান জপ করা। নাম করা।'

এইভাবে মা নানা ধর্মালোচনার মধ্য দিয়ে মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দ-সহ দিল্লীর আশ্রমে সংযম সপ্তাহের মহাব্রত পালন করলেন। রাজা মহারাজাদের মধ্যে অনেকেই সংযম সপ্তাহে ব্রতী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন, 'এই সব রাজা মহারাজাদের সংযম ব্রতে যোগদানের দৃশ্য একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। তাঁরা যখন তাঁদের স্বাভাবিক বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বর ত্যাগ করে সাধারণ তিতিক্ষাপরায়ণ একজন ব্রতীর ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে আসন

হাতে এই সপ্তাহে যোগদান করেন তখন তাঁদের দেখে রাজর্ষি বলেই মনে হয়। ঋষির ন্যায় রাজাদের আচরণ ও তৎকালীন জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষের মনেও অপূর্ব উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। মায়ের চরণে এসে সপ্তাহব্যাপী তাঁরা তাঁদের বিলাস ও ভোগের এবং দৈনন্দিন নেশার বস্তুও ত্যাগ করে সংযমিত জীবনযাপন করতে থাকেন এবং এই এক সপ্তাহের সংযমিত জীবনের প্রভাব ধীরে ধীরে তাঁদের মনকে সংযমী করে তুলতে সাহায্য করে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। অনেকের জীবনযাত্রার ধারা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কেন? এ যে সংযম সপ্তাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব তা মায়ের মুখ থেকেও শুনতে পাওয়া যায়। মায়ের কৃপা যে সব মানুষের প্রতিই অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে নারায়ণ স্বামী বলছেন, 'কাশীর ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত ভীষণ সিগারেট খেতেন। তাঁর মুখে সিগারেট কখনো প্রায় নিভতই না। কিন্তু তিনি মা'র একদিনের কথায় এতদিনের প্রবল নেশা এক মুহূর্তে ত্যাগ করে দিলেন।'

মা বলছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়ঃ হ্যাঁ, এই শরীরটা তখন কাশীর অপর পারে নৌকাতে ছিল, শরীরটা ভাল ছিল না। তাই নারায়ণ গিয়ে গোপালবাবাকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বাবার মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ খুবই আসছিল। শরীরটাকে দেখে বাবা যখন যাচ্ছে তখন আমি বললাম, বাবা, সিগারেট তোমাকে খেয়েছে, না তুমি সিগারেট খেয়েছ?

বাবা বুদ্ধিমান মানুষ। গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে করতে চলে গেল। যাবার সময় নাকি গঙ্গার মধ্যে সিগারেটের বাক্স ফেলে দিয়ে বাড়ী ফিরল। তারপর থেকে আর সিগারেট ছোঁয়নি।

সারাজীবনের কু-অভ্যাস এইভাবে মায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের প্রভাবে এক নিমেষে ত্যাগ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

সংযম সপ্তাহ পালনের ব্রতীদের উপর যে মায়ের কৃপাদৃষ্টি আছে এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নেই।

মা বলেন, 'সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর। ধৈর্য ধরে সবই সহ্য করবে। যত সহ্য করবে ততই শক্তি বৃদ্ধি হবে। শক্তি বৃদ্ধি হলে নিজের ত উপকার হয়ই, অপরকেও বিপদ হতে রক্ষা করতে পারা যায়।

দেখ একটা গাছ যখন ছোট থাকে, কত ভাবে তাকে রক্ষা করতে হয়, পরে সেই গাছ যখন বড় হয়ে যায় তার শক্তি বৃদ্ধি হয়। তখন তার নীচে যদি ছোট গাছ থাকে ঐ বড় গাছটিই ছোট গাছটিকে রক্ষা করে। যেমন ঝড় ঝাপটা যাই আসুক বড় গাছটির উপর দিয়াই সব যায়। ছোট গাছটির উপরে আর কোন ধাক্কা লাগে না।

কেউ কিছু বললো কি কিছু করলো তাতে মনে চোট লাগা স্বাভাবিক, কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা সব সরাইয়া দিতে হয়। মনে করতে হয়, হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে আমার মধ্যে যে অহংকার ছিল তা সবাবার জন্য তিনি আমাকে আঘাত দিয়ে স্মরণ করাইয়া দিচ্ছেন। আমার মনের ময়লা কাটাইয়া দিচ্ছেন।

নিন্দাটা গোবরের মত। গোবর যদি এমনি পড়ে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই গোবরই যদি মাটির সঙ্গে মিশে সার হয় তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল এবং শস্য হয়। সেইরূপ নিন্দাটা যদি সাধক, আদর্শবান মানুষ সহন করে নিতে পারে, মানে গায় মেখে নিতে পারে তবে তাতে ফল ভালই হয়। জমি উর্বরা হয় আর কি। তবেই দেখ নিন্দাটাও কত ভাল জিনিস। নিন্দাটাও সেই একই ত।

আবার দেখ, বৃক্ষের যখন শক্তি হয়ে যায়, সে বেশ বড় হয়ে যায়, তখন যদি কেউ ধাক্কা দেয়, আঘাত করে, তবে আঘাতকারীরই চোট লাগে, বৃক্ষের কিছু হয় না। এই যে দেয়াল দেখছ', বলেই মা দেয়ালে কিছু ফুল ছুঁড়ে ফেললেন, ফুলগুলি মাটিতে পড়ে গেল।

এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মা বলছেন, 'দেখ, দেয়ালের কিছুই হলো না। ফুলগুলিই ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। আবার দেখ মহাত্মা কবীরজীর জীবন, একটি লোক কবীরজীর খুবই নিন্দা করতো। লোকটি একদিন অসুস্থ হয়ে মারা গেল। কবীরজী খুব কাঁদতে লাগলেন। ভক্তরা জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ আপনি কাঁদছেন কেন? কবীরজী বললেন, 'আমার ধোবী আজ মারা গেছে। ঐ যে লোকটি আমার নিন্দা করতো সে আমার বড়ই উপকার করতো। মনের ময়লা সাফ করতো। সে সর্বদাই আমার দোষগুলি দেখিয়ে দিত। তাতে মনে অহংকার আসবার সুযোগ হতো না। দ্বিতীয়ত যদি কেউ কারো নিন্দা করে তবে নিন্দুক যার নিন্দা করে তার পাপ নিয়ে আমাকে পরিষ্কার করতো। সে যে আমার পরম বন্ধু ছিল। তাই তার জন্য কাঁদছি।'

তাই তো বলা হয় লোকনিন্দায় মন খারাপ করতে নেই। সর্বদাই তা উপেক্ষা করতে হয়। এক লক্ষ্যে স্থির থেকে বাধা বিঘ্নে নিরাশ না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাও। শুধু ব্যবসাদারের মত বার বার হিসাব না লাগিয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম করে যাও, তবেই প্রকৃত শান্তির আশা।'

সতেরো

'ভগবানে বিশেষ অনুরক্তিই ভক্তি। ভক্তের হৃদয়ে কোনও একটি কারণকে আশ্রয় করে ভাবের প্রকাশ হয়। আর সেই হৃদয়ের ভাবটি যখন বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাকেই উচ্ছ্বাস বলে।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন খাচিতে। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে। শ্রীশ্রীহরিবাবা, দিদিমা—শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিও আছেন। সৎসঙ্গ চলছে। মা আবার বলছেন, 'শব্দ হতেই এই জগতের উৎপত্তি। অবশ্য যখন তোমরা জগতের উৎপত্তির বিষয় কথা বল সেখানে। আবার যেখানে অজ্ঞাতবাদ সেখানে জগতের উৎপত্তি কোথায়? অক্ষর হ'তে শব্দ। অক্ষর মানে যার ক্ষয় নাই। যার উৎপত্তি নাই, যার বিকার নাই। শব্দেরও নাশ নাই। সাধারণ মানুষ স্থূল শব্দ ধরতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম শব্দ ধরবার তার কোন ক্ষমতা নাই।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন, সর্বদাই ত প্রণব ধ্বনিত হচ্ছে, আমরা তবে শুনতে পাই না কেন? সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে বাধা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, 'তোমাদের মনটা যে সর্বদাই সংসারের শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধে ছুটাছুটি করছে। সেই জন্যই সেই সূক্ষ্ম ধ্বনি কানে প্রবেশ করছে না। সূক্ষ্ম শব্দ ধরবার জন্য যেমন সূক্ষ্ম যন্ত্রের প্রয়োজন, সেইরকম এই প্রণবের ধ্বনি শুনবার জন্য মনটাকে স্থির ও একাগ্র করতে হয়। আবার এমন সূক্ষ্ম শব্দ আছে যা তোমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারাও ধরা যায় না।'

জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্ম থাকে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন, জীবন্মুক্তের কথা বললে সেখানে আবার কর্ম কোথায়? কর্মও থাকবে আবার জীবন্মুক্তও এ ত হতে পারে না। কর্ম থাকতে

মুক্ত হতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা সব কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। দগ্ধ হয়ে যায়। সকল কর্মের শেষ দশাই হলো জ্ঞান।

যদি তিনি আমাদেব হৃদয়েই আছেন তবে আর তাঁকে ডাকার প্রয়োজন কি? এক ভক্তের প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে মা হেসে হেসে বলছেন, 'ঐ 'যদিটুকু' নাশ করার জন্যই ডাকার প্রয়োজন। জপ ও নাম করার প্রয়োজন। এসব ত শোনা কথা, পড়া কথা। ঠিক ঠিক কি অনুভব করছো যে ভগবান তোমার হৃদয়ে আঁছেন? প্রকৃত অনুভব চাই বাবা! আবার এই অনুভবটুকুর জন্য চাই ব্যাকুলতা।'

—ব্যাকুলতা কিভাবে আসে?

—'বাবা, সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ আর যার যার গুরু যাকে যা দিয়েছেন, তা নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়া। তিনি ত সর্বত্র প্রকাশিত আছেনই। তাঁকে পেতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। আবার অপরপক্ষে তাঁকে পেতে হলে অত্যন্ত কষ্ট করতে হয়। দুই-ই সত্য। নিজেকে জানলেই তাঁকে জানা হয়। একমাত্র তিনিই ত আছেন। স্বগুণে, স্বরূপে, নির্গুণে, নিরূপে। নিজেকে পেলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

সাধনার কাজ কি? সাধনাব কাজ হলো আবরণ সরানো। সাধনার দ্বাবা অজ্ঞানের আবরণ মুক্ত হলেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। তিনি ত সাধনার অধীন নন। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। তাই তো বলা হয়, ভগবান সর্বত্র এবং সব সময়ই আছেন।'

মা বলছেন রাঁচী রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী স্বামী সুন্দরানন্দজী মহারাজকে। মা ও হরিবাবাকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা তাঁর সন্ধ্যার কীর্তন ওখানেই করলেন। সৎসঙ্গও চলতে লাগলো। মায়ের মুখের কথা শুনবার জন্য সকলেই পাগল। স্বামী সুন্দরানন্দজী বলছেন মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত শুনতে তাঁর খুবই ভাল লাগছে।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগলে নিদ্রা হয় কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মা বলছেন, 'এ প্রশ্নই আসে না। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগবে আর নিদ্রাও হবে, এক সঙ্গে দুটি সম্ভব নয়। কুণ্ডলিনী শক্তির একটু ছোঁয়া লাগলেও মানুষ বদলিয়ে যায়। তার ঢংঢাং কথাবার্তা চলাফেরা সব বদল হয়ে যায়।'

* * *

—আমার কান্না কি মায়ের কাছে পৌঁছায় না ?

কেন পৌঁছাবে না বাবা ! নিশ্চয়ই পৌঁছায়। এই অশ্রুরূপেও ত তিনিই প্রকাশিত।

—তবে এ সংসারে এত দুঃখ কেন ?

বাবা, এই সংসারের ত এই-ই রূপ। জগৎ মানেই যা গতিশীল—পরিবর্তনশীল। এই আছে, এই নাই—এই-ই-জগতের রূপ। যার যা স্বরূপ সে তা দেখাবে না ? সংসারের স্বরূপই যে দুঃখময়। যা অনিত্য তা ত বিনাশ হবেই। অনিত্যের সংসারে শান্তি কোথায় বাবা ? আর মানুষ ত কর্ম্মপূরণের জন্যই জন্ম নেয়। তাই তো বলা হয়, বিষয়বাসনার মনকে ভগবৎমুখী করে তোল। অন্তর্মুখী কর। নাম কর। স্বয়ং তিনিই যে নামরূপে। যে নাম ভাল লাগে সেই নাম নিতে নিতে, সবনাম যে তাঁরই নাম, সর্বরূপ যে তাঁরই রূপ, তা প্রকাশ হয়। নিজেকে পাওয়ার জন্যই নিজেকে প্রকাশ করা। সেই বোধে যাওয়া—আমি যে শান্তস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ। এই বোধ না হলে শান্তি কোথায়, বাবা ?

শ্রীশ্রীমা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন হাজারীবাগের ভক্ত শ্রীমনোজ রায়ের বৃদ্ধ পিতাকে। কয়েকমাসের মধ্যে তিনি দুইটি উপযুক্ত পুত্রকে হারিয়ে কাতর হয়ে পড়েছেন। শান্তির জন্য অধীর হয়ে ছুটে এসেছেন মাতৃদর্শনে। বাঁচিতে।

মৌনের পর আবার সৎসঙ্গ শুরু হলো। লোকে লোকারণ্য প্যাণ্ডেলে। শুধু মাকে দেখবে না, মাকে প্রণাম করবে আর শুনবে মায়ের মুখের অমৃতনিস্যন্দ বাণী। বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে আছেন প্রিয়রঞ্জনবাবু, বীরেশ্বর গাঙ্গুলী, দেবীবাবু, দেবব্রতবাবু, ডাঃ নগেন্দ্র দাস, ছোটনাগপুরের মহারাজকুমার ভক্ত খোকাদা ও অন্যান্যরা। আর সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর দল।

মা বলছেন, যেমন বীজ মাটিতে লাগাবার পরে জল দিলে তার থেকে অঙ্কুর ও পাতা আস্তে আস্তে প্রকাশ হয়, তেমনি মন্ত্র— বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে করতে সেই মন্ত্রের দেবতা আবির্ভূত হন। তাকেই মন্ত্র চৈতন্য বলে।

—সাধন অবস্থায় ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় কি না?

তুমি যেমন কলকাতা রওনা হয়েছো। কলকাতা না পৌঁছানো পর্যন্ত কি কলকাতা দেখা যায়? তেমনি সাধনার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের দর্শন হয় না। ভগবান দর্শন মানে আত্মদর্শন। নিজেকে জানা, নিজেকে দেখা। আবার গুরু শক্তিপাতে সবই হতে পারে। অযোগ্যকেও তিনি যোগ্য করে নিতে পারেন। সেখানে লক্ষ্য প্রকাশ ও প্রাপ্তি সবই হতে পারে।

নারায়ণ স্বামীজী মাকে প্রশ্ন করলেন, ইষ্টের ধ্যান হৃদয়ে বা ভ্রূ-মধ্যে করার নিয়ম আছে। কিন্তু গুরুর ধ্যান মাথায় করতে হয়। এর কারণ কী?

তোমাদের শাস্ত্রই ত বলে যে গুরুর স্থান সকলের উপরে। গুরুই ত মন্ত্র দিয়ে ইষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। সবার সামনে সব কথা ত বলা আসে না।

কথা প্রসঙ্গে বাঁচি আশ্রমের কালী বিগ্রহের কথাও উঠলো। ভক্ত অধীর ব্যানার্জী মাকে বললেন, ওঁর বন্ধু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নে দেখেছেন মা কালী বলছেন, 'আমি এখানকার আনন্দময়ী আশ্রমেই আছি। যা ইচ্ছা সেখানেই বলতে পার।'

মা প্রত্যুত্তরে হেসে হেসে বললেন, তোমার বন্ধুকে মা কালী দর্শন দিয়েছেন। তাকে কাল আশ্রমে নিয়ে এস। আমরাও সকলে তার দর্শন করবো।

মা'র রসিকতায় সকলেই হেসে উঠলেন। আনন্দ লাভ করলেন। পরে একদিন অবশ্য মাণিকবাবু এসে মাকে স্বপ্ন-দর্শনের কথা সবকিছু খুলে বলেছিলেন। মাও তার যথাযথ উত্তর দিয়ে তার মনকে শান্ত করে দিয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। গায়িকা শ্রীমতী রেণুকা সেন সুস্বর কণ্ঠে তিনখানি ভজন শোনালেন। রাত্রি প্রায় ১১টার পর সৎসঙ্গের আসর ভঙ্গ হলো। মা কালীর মন্দিরের পশ্চিমে যে একটু বারান্দার মত আছে সেখানেই মা আশ্রয় নিয়েছেন। অপরদিকে আশ্রমে উপরে মা'র জন্য নূতন ঘর তৈরী করা হয়েছে। সেখানে মা থাকছেন না। মা-ই জানেন এর মধ্যে কি রহস্য আছে।

* * *

'নাম কবে যা, নাম করে যা, নাম করে যা (ও মন)
নামে রুচি, ভাবে পুষ্টি, নাম করে যা ॥'

* * *

হরি নাম করে যা
দুর্গা নাম করে যা
কালী নাম করে যা
শিব নাম করে যা
মা নাম করে যা।

আবার বল হরিনাম, আবার বল,
মধুর হরেকৃষ্ণ নাম আবার বল ॥

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মা গাইছেন রাঁচির আশ্রমে। সেই অপূর্ব ভাবময় সঙ্গীত, মাতৃকণ্ঠের নামধ্বনি বাতাসকে করে ফেলে

আচ্ছন্ন। ভক্ত হৃদয়ে দেয় দোলা। সেই মধুর সঙ্গীতে ভরে যায় শূন্য দিগঙ্গনা……আনন্দ…আনন্দ…আনন্দ ছাড়া আর কিছু নাই বিশ্ব-ভুবনে……ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার……। মাকে ঘিরে রাচির আশ্রম, রাঁচির আকাশ বাতাস মেতে উঠলো, নেচে উঠলো কীর্তনানন্দে। যেন এক প্রেমের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে চলেছে সমগ্র রাঁচি শহরের মধ্য দিয়ে।

আবার সুরু হয় নানা কথা নানা আলোচনা। ভগবৎ-প্রসঙ্গ। হঠাৎ একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, মা, রাঁচি আশ্রমের কোনও বিশেষত্ব নাই? প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, 'একদিন দেখছি যে এই স্থানটি ঘোর জঙ্গল। চারিদিকে কোন লোকালয় নাই, কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি দেবীর স্থান। সেখানে পাঁঠা বলি হয়। ঐ জঙ্গলের মধ্যেই একটু স্থান হরিবাবা যেন পরিষ্কার করে কীর্তনের জায়গা করে নিয়েছেন। এর মধ্যে চার পাঁচ জন বেশ দীর্ঘকায় লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। ঐ লোকেরা যেন তোমাদের এখানকাব মহারাজকুমারদের বংশের। তারা বলছে হরিবাবাকে আমাদের এই জায়গাটা খালি করে দিন। আমরা দেবী পূজা করবো। বলি দেবো। এই শরীরটাও বাবাকে বলছে, বাবা, জায়গাটা খালি কবে দাও। উত্তরে বাবা বললেন, মা, জায়গাটা আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কীর্তন আরম্ভ করেছি, এইভাবে জায়গা ছেড়ে দিলে আমরা কীভাবে কীর্তন করবো?' এই পর্যন্ত বলে মা নীরব হলেন।

এই প্রসঙ্গে গুরুপ্রিয়াদেবী বলছেন, 'মা'র মুখের এই সব কথা হতে বুঝলাম যে এই স্থানে পূর্বে দেবীপূজা ও কীর্তনাদিরও ব্যবস্থা ছিল। মা'র যত আশ্রম আছে প্রায় সব স্থানেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছেই।'

আগরপাড়া আশ্রম সম্বন্ধেও এক ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি শুনেছেন, ঐ স্থানটিও সাধু মহাত্মাদের তপস্যার স্থান ছিল। কলকাতা

আগরপাড়া আনন্দময়ী আশ্রমও হঠাৎ কিভাবে যেন যোগাযোগ হয়ে কেনা হয়। সেও এক বিচিত্র ইতিহাস। দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া প্লেসের আশ্রমবাড়িতে মা এলে স্থানাভাবের জন্য সকলেরই কষ্ট হতো। অসংখ্য ভক্তসমাগম হয়, সেই অনুপাতে জায়গা কম। তাই অনেকেই অনুভব করছিলেন অনেকখানি জায়গা নিয়ে আশ্রমবাড়ি হলে মন্দ হয় না। আব সেটি যদি গঙ্গাতীরে হয় তাহলে ত কথাই নেই। ১৯৫৭ সনে কালীপূজা উপলক্ষে ভক্তিমতী চামেলী বসু গেলেন কাশীধামে। কথায় কথায় বললেন, তাঁর ভাসুরপুত্রের একটি বাগানবাড়ি আছে আগরপাড়ায় গঙ্গাতীবে। তারা সেই বাড়িটি বিক্রি করবে। এক লক্ষ টাকা চায়। তবে আশ্রমের জন্য নিলে কিছু কম করবে। কথাবার্তা হচ্ছিল শ্রীশ্রীমা'ব সম্মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্মিত হয়ে শ্রীমতী বসু দেখছিলেন আনন্দময়ী মা ওঁর সামনে নেই, উনিও কাশীধামে নেই। আগরপাড়ার সেই বাড়িটির পশ্চিমের বারান্দায় মা পায়চারি করছেন আর শ্রীমতী বসু সেখানেই রয়েছেন। এই ব্যাপাবটি ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, অনেকটা স্বপ্নের মত। তখন ওঁর আচ্ছন্ন অবস্থা। অনেক পরে অবশ্য এই ঘটনার কথা তিনি প্রকাশ কবেছিলেন। ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত এই বাড়িটিই আশ্রমের জন্য কেনা ঠিক হয়।

মা বলেন, এই শরীরটার কাছে সবই সমান। নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করা হয় না। এক একটা উপলক্ষে সবই হইয়া যাইতেছে। আবার দেখ এই শরীরটাকে শিব প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখিয়া কেউ কেউ হয়ত মনে করে, মা খুব শিব ভক্ত। কথা শেষে মা হাসতে লাগলেন। সেই রহস্যময়ী হাসি। রস ও রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠলো মায়ের মুখের হাসি।

আঠারো

"পরমেশ শরণাগতোঽহং শরণাগতোঽহং।' এই পদটি মা সুস্বর কণ্ঠে বারে বারে উচ্চারণ করছেন। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে। আকুল প্রাণের ভক্তিকে ভাষা ছন্দ আর সুরের মাধ্যমে যেন পাঠিয়ে দিলেন সেই পরমেশ্বরের কাছে। সারা আকাশটা মাধুর্য ও শান্তিতে যেন ভরে উঠেছে। সেই স্বর্গীয় সুরধ্বনিতে সুর মিলিয়ে পাখীরা কলকূজন করে ওঠে। তরুলতা পত্রপল্লব দোলায় আর গোমতী নদীর বুকে ওঠে তরঙ্গ। তার কলস্বর যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হয় আনন্দময়ী মা'র প্রতিচ্ছায়া।

মা এখন নৈমিষারণ্যে। অদূরে সেই সুপ্রাচীন গোমতী নদী প্রবাহিতা। বহু ঋষি মুনি কবি তপস্বীর স্মৃতির আশ্রয় এই গোমতী নদী আর নৈমিষারণ্যের মাটি। যুগ যুগ ধরে শত শত ভক্ত ও সাধকের অভ্যর্থনা লাভ করে এসেছে। এখানকার ধূলিকণিকাও তীর্থরেণুর গৌরব লাভ করেছে। বহু ঐতিহাসিক মহিমার আস্পদ এই নৈমিষারণ্য আর গোমতী নদী। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাব্য ও বহু ধর্মগ্রন্থ রচনার জন্মভূমি। সেই প্রাচীন বৈভব আজ আর নেই, কিন্তু আছে তার স্মৃতিচিহ্নগুলি। আজও তাই পূর্ণিমা তিথি, নবরাত্র ও অমাবস্যার পুণ্য স্নান উপলক্ষে শত শত পুণ্যকাম স্নানার্থীর কোলাহল জাগে গোমতী নদীর ঘাটে, নৈমিষারণ্যের মাটিতে। অতীত যুগেব সুমহান ধর্মবৃক্ষ যা এই পরমতীর্থ ভূমিরই মাটির আবরণে লুপ্তপ্রায় হয়ে রয়েছে তাকেই জীবন্ত করে ফুলে ফলে শোভিত করে তুলবার জন্যই যেন আনন্দময়ী মা এসেছেন। মা এসেছেন ১০৮ ভাগবত পাঠ ও সংযম সপ্তাহকে

উপলক্ষ করে। আর মাকে কেন্দ্র করেই বসে গেছে আনন্দের হাট। সংযম সপ্তাহও সুরু হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসী যোগী মহাপুরুষ সাধারণ অসাধারণ বিশিষ্ট মানুষের মেলায় মুখর হয়ে উঠেছে নৈমিষারণ্যের মাটি আকাশ বাতাস। একশত প্যাণ্ডেল খাটানো হয়েছে ভক্তদের থাকবার জন্য। অসংখ্য কুঠিয়াও তৈরী হয়েছে সন্ন্যাসীদের জন্য। নারদানন্দ স্বামীজীর আশ্রম বিভিন্ন ধর্মশালা ও অন্যান্য আশ্রমও ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীর মেলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। সীতাপুর থেকে দলে দলে ভক্ত মানুষ আসছে প্রতিদিন মাতৃদর্শন মানসে। দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন মহেশ্বরানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, বিষ্ণু আশ্রমজী, চেতনগিরিজী, অবধূত কৃষ্ণানন্দজী, চক্রপাণিজী, শ্রীযুত যোগেশ ব্রহ্মচারী। আবার এঁদের সঙ্গেও এসেছেন অনেক ব্রহ্মচারী, সাধুর দল ও ভক্ত দেবব্রত, সত্যব্রত এবং কিরণশশী দেবী।

নৈমিষারণ্যের ইতিহাসেই যেন এইবার ভোরের আভাস লাগলো। মুগ্ধচিত্তে দেখতে থাকেন সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী পণ্ডিতবর্গ আর সাধারণ মানুষের দল, ধীরে ধীরে জেগে উঠছে সত্যিকারের নৈমিষারণ্য। সকল যুগের মাধুরী মিশিয়ে রচিত নৈমিষারণ্যের উদার হৃদয়ের রূপ ধীরে ধীরে উঠছে ফুটে। বহু শতাব্দীর মিলনতীর্থ সুসংস্কৃতির নৈমিষারণ্য জেগে উঠছে আনন্দময়ী মা'র স্পর্শ পেয়ে। বেদ ও ভাগবত স্তোত্রাদির পাঠধ্বনি কয়েক শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হয়ে চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে ভেসে চলে। সেই ছন্দোবদ্ধ সুস্বর কণ্ঠের মধুর ধ্বনি সকলের অন্তরকে যেন স্নিগ্ধধারায় অভিষিক্ত করে তোলে। সেই অপরূপ সুরের দোলায় দোলে আনন্দময়ী মা'র অন্তর। সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও সাধারণ ভক্ত মানুষদেরও দোলায়। যুগযুগান্ত ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ঠিক যেমন দুলছে এই নৈমিষারণ্যে, পূর্বে যারা এসেছিল। যত দূরে পিছনে

চেয়ে দেখা যায়, কালের সুগভীর অন্ধকার স্তরে, চেতনার প্রতি মোড়ে মনে হয় সেই পরিচিত ধ্বনিই যেন ধ্বনিত হয়ে চলেছে। নিশীথে নীরবতার মধ্যেও সেই স্তোত্রাদি পাঠের ধ্বনি, রামায়ণ গান, নানা পুরাণ গ্রন্থের নানা আলোচনার কলধ্বনি যেন বাতাসে বয়ে নিয়ে আসছে। সেই কলস্বনা শব্দের নদী! গোমতী নদীর কলস্বর নয়, উপনিষদ রচয়িতা মহর্ষি মহাকবিদের অনন্ত মাধুরীভরা মৃদু কলস্বর, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনির স্পষ্ট মধুর আওয়াজ,—আনন্দমুখর শিশুদের হাসির মত কানে ভেসে আসে। আনন্দময়ী মা যেন খুশি হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকেন সেই দৃশ্য আর শুনতে থাকেন সেই অপরূপ ধ্বনি সঙ্গীত।

…ছায়ারা মিলিয়ে যায়। সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নৈমিষারণ্যের মাটি আর গোমতী নদী।

আনন্দময়ী মা এখন আছেন গোমতী তীরে। কুঠিয়াতে। ভক্তপ্রবর প্রয়াগনারায়ণ এই কুঠিয়া তৈরী করেছেন। প্রয়াগনারায়ণ সীতাপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মায়ের স্নেহধন্য। মা বললেন, প্রয়াগ কি না ত্রিবেণী এই শরীরকে এখানে এনেছে। কত কষ্ট এই শরীরের জন্য করছে। স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীও ভক্তিমতী রমণী। ঘর বাড়ি ফেলে মা'র কাছে পড়ে আছেন। স্থানটি মনোরম। নিকটেই একটি টিলা। সেখানে বিরাট এক হনুমান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই তো টিলাটির নাম হনুমান টিলা। ব্যাসগদীও বেশী দূরে নয়। ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত রচয়িতা মহাকবি, সকল সম্প্রদায়ের গুরু আচার্য বেদব্যাসের তপস্যাভূমি।

সংযম সপ্তাহে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠের কথা হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ গ্রন্থ কোথায়? সমস্ত নৈমিষারণ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। মা বললেন, 'এই তপস্যার স্থান, পুরাণের স্থান! এখানে সব পুরাণাদি গ্রন্থ থাকলে ভাল হয়।' অবধূতজীকে বললেন, 'তুমি এর ব্যবস্থা কর।' অবধূতজী

সন্ন্যাসী মানুষ, উনি আর কি করবেন। বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ শুনলেন আনন্দময়ী মা'র শ্রীমুখের কথা আর অন্তরের ইচ্ছা। ভক্ত প্রয়াগ-নারায়ণ, পান্নালালজী শ্রীযুত মোদী, যোগীভাই ও অন্যান্য বিশিষ্ট অর্থশালী ভক্তরা মায়ের সাধু ইচ্ছাকে রূপায়িত করবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। নৈমিষারণ্যে শুধুমাত্র পুরাণ গ্রন্থরাজী রাখবার ব্যবস্থাই হবে না, পুরাণ বিগ্রহও স্থাপিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পরি-কল্পনাও হলো। কর্মযোগী পরমানন্দ স্বামীজী প্রতিষ্ঠার কার্যকে সুসম্পন্ন করে তুলবার সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ভক্তবৃন্দ হনুমান টিলাকে মন্দির স্থাপনের যথার্থ স্থান বলে বিবেচনা করলেন। উঁচু জায়গা। জল উঠতে পারবে না।

ভক্তদের এই জলাতঙ্কেরও এক বিচিত্র ইতিহাস। যখন সংযম সপ্তাহ ও ১০৮ ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠানের সমস্ত কিছুই স্থির। মা রয়েছেন ডেরাডুনে। স্বামী পরমানন্দ গেছেন নৈমিষারণ্যে সবকিছু ব্যবস্থা করতে। অক্টোবর মাস। স্বামীজী লিখলেন, 'আমরা আন্দামানে আছি।' চারিদিকে জল আর জল। গোমতীর জল বেড়েই চলেছে। সাধু সন্ন্যাসী ভক্তদের থাকবার কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্ণৌও ভাসমান। লক্ষ্ণৌতে ভক্ত রামেশ্বর সহায়ের বাড়িতে হবে শ্যামাপূজা মায়ের উপস্থিতিতে। আর নৈমিষারণ্যে ভাগবত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। এত বড় ব্যাপার কিভাবে সম্পন্ন হবে? ভক্তরা সকলেই যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মায়ের মুখের হাসিটুকু কিন্তু ঠিকই আছে।

রামেশ্বর সহায় বললেন, মা, নৈমিষারণ্যে এত জল, এত বড় অনুষ্ঠান কি করে সম্ভব হবে? নৈমিষারণ্য গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ, জল যদি কমেও তবুও এত বড় কাজ করা খুবই কষ্ট হবে।

প্রত্যুত্তরে মা বললেন, 'এই শরীরের কোন কথা নাই। পরমানন্দ সব ব্যবস্থা করতে গেছে। সব দেখে পরমানন্দ যা স্থির করবে তাই হবে।'

গুরুপ্রিয়াদেবী বললেন, কিছুই হবে না। মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে আমাদের কর্মক্ষয় করিয়ে নেবেন।

গম্ভীরভাবে মা বললেন, এ তোদের দেখি দুঃসাহস। এত জল চারিদিকে! তারপর হঠাৎ একবার বললেন, এত জল! ঠাকুর, গ্লাসের জলের মত চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেই ত হয়! এ কথার গূঢ় অর্থ বুঝলেন গুরুপ্রিয়াদেবী। রহস্যময়ী মা এইভাবেই লীলা করে চললেন ভক্তসনে।

সংবাদ এলো লক্ষ্মৌ থেকে জল কমছে। কালীপূজা লক্ষ্মৌতে হওয়া সম্ভব। স্বামী শিবানন্দকে (শম্ভুদাকে) পাঠানো হলো লক্ষ্মৌ ও নৈমিষারণ্যে খবর সংগ্রহের জন্য।

আনন্দময়ী মা'র দিবানিদ্রার স্বপ্ন তখন নৈমিষারণ্য। সুপ্ত নৈমিষারণ্যকে কি করে জাগিয়ে তোলা যায়। যত জলই হোক আর যত বাধাই আসুক। মা আবার বলছেন, 'দেখ, কত কাল হতে ঐ স্থান জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। মানুষ পশুপক্ষী কতভাবে তাকে অপবিত্র করছে। তারা যে জানে না এ স্থানমাহাত্ম্য।' মায়ের দু'চোখ যেন জলে ভরে উঠলো। ঋষি মুনি মহাকবিদের সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত করবার জন্য জাগিয়ে তুলবার জন্য আনন্দময়ী মা'র প্রাণ যেন আকুল হয়ে উঠলো।

অবশেষে মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। ধীরে ধীরে জল নেমে গেল। জলপ্লাবন বন্ধ হলো। ক্ষীণকায়া গোমতীর কলধ্বনি মধুর সঙ্গীতের মতই শোনা যেতে লাগলো। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো নৈমিষারণ্যের মাটি আর আকাশ বাতাস।

মা এলেন চক্রতীর্থে। চক্রতীর্থের জল স্পর্শ করলেন। সাধু সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দরাও সঙ্গে রয়েছেন। সকলের গায়ে জলের ছিটা দিলেন। সকলেই কৃত-কৃতার্থ হলেন। কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। কীর্তনানন্দে বিভোর হলেন শ্রীশ্রীমা। সকাল সন্ধ্যা কীর্তন চললো। ভক্তকণ্ঠের হরিনামগানে ও সুধাস্রাবিত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে

নৈমিষারণ্যের আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠলো। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল শৌনকাদি প্রভৃতি কয়েক সহস্র ঋষির তপস্যাভূমিতে আজ আনন্দময়ী মা পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এলেন মিশরিকে। মিশ্রিত তীর্থভূমিতে। 'সেই সর্বতীর্থ একাধারে দধীচি আশ্রমে।' যখন ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরের অত্যাচারে অস্থির হয়ে দধীচি মুনিব অস্থি প্রার্থনা করলেন, দধীচি মুনি দেবতাদের উপকারের জন্য অস্থি দানে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু বললেন, 'আমি ত অস্থি দিতে এখনই প্রস্তুত। কিন্তু আমার একটি সংকল্প আছে। আমি সমস্ত তীর্থে স্নান করবো আর সমস্ত দেবতাদের দর্শন করবো। এই কাজটি হয়ে গেলেই আমার প্রাণত্যাগ করতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা থাকবে না।'

দেবতারা দেখলেন এতদিন অপেক্ষা করলে, আমাদের বৃত্রাসুরের হাতে কি গতি হয় কে জানে! তাই তাঁরা বললেন, 'এই মহান ঋষির আশ্রমেই সমস্ত তীর্থ একত্রিত হোক।' দেবতাদের ইচ্ছায় সমস্ত তীর্থ দধীচির আশ্রমেই একত্রিত হলো। সেখানে স্নান করে দধীচি মুনির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তিনি তখন দেবতাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন! সমস্ত তীর্থ একত্রিত বা মিশ্রিত হয়েছিল বলে এ স্থানের নাম মিশরিক বা মিশ্রিত তীর্থ।

একদিকে ভাগবত পাঠের কলস্বর অপরদিকে সংযম সপ্তাহের কলরোল। আবার হরিনামগানের ধ্বনিতে মুখর নৈমিষারণ্যের বায়ুমণ্ডল। লোকে লোকারণ্য। যেন ইন্দ্রোৎসবের হর্ষ জেগে উঠছে নৈমিষারণ্যের পবিত্রভূমিতে। আবার নানা কথা নানা ধর্মালোচনা।

নারদানন্দ স্বামীজী বললেন নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য, সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে। আত্মানন্দজী আনন্দময়ী মা'র উদ্দেশ্যে দেবী-স্তোত্র পাঠ করলেন। ডাঃ পান্নালালজী করলেন নারদীয় ভক্তিসূত্র পাঠ। মায়ের সম্মুখে সুস্বর কণ্ঠে গান শোনালেন বিভুদা, হীরুদা,

রেখাদি, সন্ধ্যাদি ও শ্রীমতী জয়াবেন। সকলেই আনন্দে ভরপুর। আনন্দ···আনন্দ···আনন্দ ওগো মহানন্দ···অনন্ত অপার!

সৎসঙ্গ কীর্তনাদি নিয়মিত চলছে। সৎপ্রসঙ্গাদিও হচ্ছে। কথায় কথায় মা একটি গল্পের অবতারণা করলেন।

এক ছিল রাজা। তিনি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য পণ্ডিত-সমাজকে ডেকে পাঠালেন। প্রশ্নগুলি হলো, ভগবান কোথায় থাকেন? কী খান? কখন হাসেন? আর কী করেন? রাজা ঘোষণা করলেন এই প্রশ্নগুলির উত্তর যে দিতে পারবে, তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। অনেকেই অনেক কথা বললেন। কিন্তু রাজার মনঃপূত হলো না। মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। বড় বড় পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন আর নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ঠিক ঠিক উত্তর কেউই দিতে পারছেন না। সেই রাজ্যের এক কৃষক সব শুনে ভাবলো, এই সরল সহজ প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দিতে পারছে না, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। এ সব প্রশ্নের উত্তব আমিই ত দিতে পারি। সে অনেককে বলেও ফেললো তার মনেব কথা। কেউ কেউ ভাবলো একে নিয়েও মজা হবে বেশ। উত্তর ত আর দিতে পারবে না, একটু হাসাহাসি করা যাবে রাজসভায়। তারপর কৃষকটিকে খুব উৎসাহ দিল রাজসভায় যাবার জন্য। তারপর কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি ওকে রাজদরবারে নিয়ে গিয়ে বললো, মহারাজ, এই লোকটি বলছে আপনাব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। মহারাজও কৃষক বলে ঘৃণা করলেন না। বললেন, বেশ ত, উত্তর দাও। প্রথম প্রশ্ন হলো, ভগবান কোথায় থাকেন? কৃষকটিও উৎফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ বললো, ভগবান কোথায় নাই মহারাজ? উত্তরে রাজা খুব খুশী হলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো,—ভগবান কী খান?

ভগবান অহংকারকে খান। রাজা মহাখুশী হয়ে তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, ভগবান কখন হাসেন? প্রত্যুত্তরে কৃষক বললো, জীব

যখন গর্ভে থাকে তখন খুব ভগবানকে ডাকে আর প্রার্থনা করে, হে ভগবান, এই গর্ভযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করো। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। চিরদিন তোমার নাম করবো। কিন্তু জন্মগ্রহণ করেই সব ভুলে যায়। ভগবান তখন খুব হাসেন আর বলেন, এমনই আমার মায়া। চতুর্থ প্রশ্ন হলো, ভগবান কী করেন? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে কৃষক কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। রাজসভায় এবারে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। যারা মজা দেখবার জন্য এসেছিল এবারে তারা স্ব-রব হয়ে উঠলো। ব্যাটা চাষা, ও আবার এর কী উত্তর দেবে? বড় বড় পণ্ডিতেরাই পারলো না। রাজা বললেন, কী হে, জবাব দাও। এবার কৃষকটি বললো, মহারাজ, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একটু বসবার জায়গা চাই। রাজা তার তিনটি উত্তরে মহাখুশী হয়েছেন। তাই স্নেহল কণ্ঠে বললেন, বেশ ত, নির্ভয়ে বল তোমার কিরূপ আসন চাই। কৃষকটি তখন একবার এদিক ওদিক চেয়ে বললো, মহারাজ, এই প্রশ্নের জবাব বড় কঠিন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এসে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, আর আপনার ঐ সিংহাসনে আমাকে বসতে দিতে হবে। রাজা চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরটির জন্য তখন খুবই উদগ্রীব। তাই আর আপত্তি করলেন না। কৃষকটির নির্দেশ পালন করলেন। কৃষকটি রাজসিংহাসনে বসেও নীরব হয়ে রইলো। এবারে রাজা অধৈর্য হয়ে বললেন, জবাব দাও আমার প্রশ্নের। এবারে কৃষক হেসে বললো, মহারাজ, ভগবান এই করেন। আমীরকে গরীব করেন আর গরীবকে আমীর করেন। যেমন এই মুহূর্তে সকলের সামনে ঘটলো। সত্যি কি না মহারাজ? এবারে আসুন, আপনার সিংহাসনে আপনি বসুন। এই কথা বলে কৃষকটি সিংহাসন থেকে নেমে পূর্বের স্থানটিতে এসে দাঁড়াল। রাজা এবং রাজসভার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই মুগ্ধ বিস্মিত ও আনন্দিত হলো কৃষকটির যথাযথ উত্তরে।

রাজা তাকে আনন্দিতচিত্তে পুরস্কৃত করলেন। সেও মহাখুশী হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো।

গল্প শেষে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও মহাখুশী হলেন মায়ের মুখনিঃসৃত গল্পটি শুনে। এইভাবে বেলা দেড়টায় সৎসঙ্গের আসর ভঙ্গ হলো। মাও উঠে গেলেন কুঠিয়াতে। দুপুর গেল, বিকেল গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। শ্রীশ্রীমা আবার ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে বসলেন। একজন দণ্ডীস্বামী এসেছেন। নানা আলোচনার মধ্যে তিনিও বক্তব্য রাখলেন। বললেন, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য যে দেখা এই মায়া। এবারে একজন ভক্ত বললেন, সবই ত ব্রহ্ম, তবে এই ব্রহ্মের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি কি করে এলো? মায়া ঢুকলো কি করে? ব্রহ্ম ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। মা মৃদু হেসে দণ্ডী-স্বামীজীকে বললেন, বাবা, এই প্রশ্নের মীমাংসা করে দাও।

তিনি তখন নানা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে বোঝাতে বসলেন। 'ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সন্দেহ নেই। তবে এই ভ্রান্তির আবরণে ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে। এই আবরণ কেটে গেলেই যেই সেই ব্রহ্ম। জীবের অহংকারেই এইরূপ হয়। এই হলো মায়া। প্রশ্নকর্তা এসব মানছেন না। তিনি বলছেন, ব্রহ্ম শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। তার মধ্যে আবার ভ্রান্তি আসল কি করে? মায়া ও ব্রহ্ম তাহলে দুই হলো। এইভাবে তর্ক আরও অগ্রসর হতে লাগলো। তখন আনন্দময়ী মা বললেন, ব্রহ্ম মায়া দুই নয়। দুই-ই এক। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি তোমরা বল না? বলছ ব্রহ্মের মধ্যে ভ্রান্তি ঢুকলো কি করে? ঢোকা আবার কি? তিনিই তাঁকে নিয়ে খেলা করছেন। বহু হইব এই ভাবনার সৃষ্টি। এ সবই যে তাঁর খেলা—লীলা। নিজেকে নিয়েই খেলা করছেন।' প্রশ্নকর্তা তখন বললেন, 'আমিই ত ব্রহ্ম।' প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, 'ইহা মুখে বলছো। ইহা ঠিকই যে তুমি ব্রহ্ম। কিন্তু তোমার সে

জ্ঞান কই ? সে জ্ঞান থাকলে আর প্রশ্ন উত্তর কোথায় ? কোন জিজ্ঞাসাই থাকতো না। সেই অনুভব চাই। সেই বোধে যাওয়া চাই। ব্রহ্মানুভূতি হলে আর কথা থাকে না।'

এবারে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের সমাপ্তি ঘটলো যথার্থ উত্তরটি পেয়ে। শ্রোতাগণও মুগ্ধ হলেন। মহানন্দে ভক্তবৃন্দ গোমতী নদীর তীরে মাতৃসঙ্গ করতে লাগলেন এইভাবে দিনের পর দিন। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহাও সোনা হয়ে যায়, আনন্দময়ী মা'র সঙ্গ করে বিষয়াসক্ত মানুষের মনও নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হলো। ভাবময়ী মাকে আশ্রয় করেই তারা ভাবানন্দে হলো বিভোর। সর্বদাই যেন তাদের কানে ভেসে আসছে গোমতী তীরের কুঠিয়া থেকে মাতৃকণ্ঠের স্বর্গীয় সেই মৃদুমধুর ধ্বনি 'পরমেশ শরণাগতোঽহং শরণাগতোঽহং'……। সুনন্দিত হৃদয়ের অর্ঘ্যের মত ভোরের আলোয় একটি স্তবক প্রতিদিনই এসে যেন লুটিয়ে পড়ছে আনন্দময়ী মা'র কুঠিয়ার দ্বারে। তখন কাঁপন লাগে গোমতীর জলে। কাঁপন নয়, শিহরণ জাগে গোমতীর বুকে। আনন্দময়ী মা'র হাসিভরা মুখের প্রতিচ্ছবি যে ফুটে উঠেছে গোমতী নদীর জলে! ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈমিষারণ্য। মহাতীর্থ ভারতের মহা-মিলনক্ষেত্র নৈমিষারণ্য।

*　　*　　*

মা শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করছেন গুরুপ্রিয়াদেবীকে, কয়দিন হলো এখানে আসা হয়েছে ?

১০শে অক্টোবর আসা হয়েছে। বাইশ-তেইশ দিন হয়ে গেল।

মা আর কিছু বললেন না। ধ্যানস্থ হলেন। তারপর অকস্মাৎ একদিন নৈমিষারণ্যের আনন্দের হাটকে পেছনে ফেলে আবার এগিয়ে চললেন সম্মুখের পথে। চলা চলা আর চলা! মায়ের পথ চলার যেন শেষ নেই।

চলাতেই হয় অমৃতত্বলাভ। চলাতেই লাভ হয় তার স্বাদু সুমিষ্ট

কল। চেয়ে দেখ সূর্যের দিকে। সূর্যের কি আলোকসজ্জায় সে সূর্য সৃষ্টির প্রথমতম মুহূর্ত থেকে অতন্দ্রিত চলার পথে এগিয়ে চলেছে। অতএব চল এগিয়ে। চল এগিয়ে। চল:

চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদু মুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণম্ যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্।
চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি॥